১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা : ৯

পাহাড়তলী গণহত্যা

চৌধুরী শহীদ কাদের

মুজাফরাবাদ গণহত্যা

চৌধুরী শহীদ কাদের

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর

bis.org.bd

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা : ৯

গ্রন্থমালা সম্পাদক : মুনতাসীর মামুন

সহযোগী সম্পাদক : মামুন সিদ্দিকী

প্র কা শ কা ল

পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪

©

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট

বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী

itihassammilani.bd@gmail.com

01816288674, 01715457382, 01711217111

প্র কা শ ক

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট

৩৩৪ শের-এ-বাংলা রোড

ময়লাপোতা মোড়, খুলনা ৯১০০

মু দ্র ক

প্র চ্ছ দ

মূ ল্য

ISBN:

গ্রন্থমালা প্রসঙ্গে

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা-নির্যাতন। একের অধিক মানুষকে হত্যাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে গণহত্যা হিসেবে। নির্যাতনের অন্তর্গত শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও দেশত্যাগে বাধ্য করাও এর অংশ। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বগাথা সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং তা স্বাভাবিক। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন একটি দেশে এত অল্প সময়ে এতো হত্যাও হয়নি যা হয়েছে বাংলাদেশে। যদিও আমরা বলি ৩০ লক্ষ শহীদ হয়েছেন কিন্তু মনে হয় সংখ্যাটি তারও বেশি হবে। গণহত্যা, বধ্যভূমি নির্যাতন মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে একেবারে নেই তা নয় কিন্তু গুরুত্ব ততোটা এর ওপর দেয়া হয়নি। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগের ব্যাপারটি আড়ালে পড়ে যায়। কিন্তু ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে গণহত্যা হয়েছিল তার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা সব ক্ষেত্রে এখনও সেই গণহত্যা-নির্যাতনের কথা ফিরে আসে। যে কারণে ইউরোপে ফ্যাসিবাদ আর নাজিবাদ জায়গা করে নিতে পারেনি। আমাদের এখানে তা হয়নি দেখে গণহত্যার সংখ্যা নিয়ে এখনও অনেকে প্রশ্ন করার সাহস রাখেন এবং হত্যাকারীদের সমাজ ও রাজনীতিতে এমনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে তারা একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশে সামরিকবাদ, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ আবারও শেকড় গেড়েছে।

এ দেশে গণহত্যা-নির্যাতন চালিয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর, শান্তি কমিটির সদস্যরা। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ থেকেই মূলত এসব বাহিনীতে গেছে কর্মিরা। সুখের বিষয়, এসব মানবতা-বিরোধীদের বিচার শুরু হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে।

দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর যার পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখনও করা সম্ভব হয়নি। নির্যাতনের শিকার বহু নারী-পুরুষ এখনও রোমহর্ষক স্মৃতি রোমন্থন করেন। সেসব গণহত্যার বৃত্তান্ত, বধ্যভূমি ও গণকবরের কথা, এমনি কী নির্যাতনের কথা বিজয়ের গৌরব-ভাষ্যে উপেক্ষিত থেকে গেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায়, অনুপুঙ্খ ইতিহাস অনুসন্ধানে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম। গণহত্যা, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত সংগ্রহশালা তৈরি আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উঠে আসার পাশাপাশি উত্তরপ্রজন্মের মাঝে মুক্তিসংগ্রামের মর্মবাণী প্রতিভাত হবে। এই তাগিদ থেকে গড়ে ওঠেছে বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর উদ্যেগে '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট'। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর ও নানামুখী নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ এবং জাতির সামনে মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা তুলে ধরা। এর পাশাপাশি একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, শোষণমুক্ত ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণের বাণী প্রচার করা এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ।

এরই আলোকে মুক্তিযুদ্ধকালে এ যাবৎকালে প্রাপ্ত প্রায় সহস্রাধিক গণহত্যা ও বধ্যভূমির ওপর ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি গণহত্যার ইতিবৃত্ত তুলে ধরা '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা'র উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি পুস্তিকা লেখকের স্বকীয়তা বজায় রেখেও নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে প্রণীত হবে। এর বিষয়-বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান, তৎকালীন অবস্থা, গণহত্যার পটভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ, শহীদ ও নির্যাতিতদের নাম-পরিচয়, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য, গণহত্যায় জড়িতদের নাম-পরিচয়, বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস, বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক মূল্যায়ন। প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য থাকলেও পুরো কাজটি গবেষণাধর্মী ও অনুসন্ধানমূলক।

এ কাজের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, লেখক গণহত্যা ও বধ্যভূমির স্থলে সরেজমিনে গিয়ে, খোঁজ-খবর নিয়ে, সবার সঙ্গে কথা বলে, পর্যবেক্ষণ করে– অন্তরে অনুভব করে তবেই এই ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন। সবার হৃদয় নিংড়ানো কথামালা যেন এখানে মেলে ধরেছে সেই ভয়াল দিনের স্মৃতি। ফলে এর মধ্য দিয়ে যে সংশ্লিষ্ট গণহত্যা ও নির্যাতনের কথা অকৃত্রিমরূপে উঠে এসেছে– এ ভরসা আমরা করি।

বর্তমান পুস্তিকা 'মুজাফরাবাদ গণহত্যা'য় চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার মুজাফরাবাদ গ্রামে গণহত্যা-নির্যাতনের বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন চৌধুরী শহীদ কাদের। নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করেও তিনি এ কাজে মুজাফরাকাদ গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি এর বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরেছেন। আমাদের এই প্রয়াসে যুক্ত হওয়ার জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যা-নির্যাতন, বধ্যভূমি ও গণকবর সংক্রান্ত বিদ্যাচর্চায় এ গ্রন্থমালা বিশেষ আলো ফেলবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে শুধু গৌরব নয়, মুক্তিযুদ্ধের বেদনাবিধূর কাহিনী তুলে ধরতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস উঠে আসবে। এই বেদনা ও গৌরবের কাহিনী বয়ানের মাধ্যমে মানবতার জয়গান করে সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণ আমাদের লক্ষ্য।

মুনতাসীর মামুন
গ্রন্থমালা সম্পাদক

ভূমিকা

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বিপ- বী মাস্টারদা সূর্যসেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের স্মৃতি বিজড়িত পাহাড়তলী। মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য নৃশংসতার বর্বরতার সাক্ষী এই পাহাড়তলী। প্রায় দশ হাজার লোককে মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার প্রক্রিয়াও ছিল অত্যন্ড় পৈশাচিক। একদিনে বধ্যভূমিতে সবচেয়ে বেশি লোক হত্যা করা হয়েছে ১০ নভেম্বর ১৯৭১। এই দিন হত্যা করা হয়েছে প্রায় ৪০০ লোককে। এখানে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই ছিল স্থানীয় মাস্টার লেন, পাঞ্জাবী লেন (বর্তমানে শহীদ লেন), গোয়ানিজ কোয়ার্টার, ঝাউতলা, সরাইপাড়া এলাকার বাসিন্দা। শহীদ হওয়া লোকজনের একটি বড় অংশই চাকরি করতেন পূর্ব পাকিস্ড়ান রেলওয়েতে। মূলত চাকরির কারণে এই পরিবারগুলো পাহাড়তলীতে থাকত। এছাড়াও দোহাজারী নাজিরহাট র"টের ট্রেনগুলো যেত পাহাড়তলীর উপর দিয়ে। এসব ট্রেন থেকে নামিয়ে প্রচুর লোককে হত্যা করা হয়েছে এই বধ্যভূমিতে। স্থানীয়ভাবে এই বধ্যভূমিটি জল- াদখানা নামে পরিচিত।

এই বধ্যভূমিতে পাহাড়ের ওপরে ছিল সুরম্য একটি দোতলা ভবন। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের বিপরীতে অবস্থিত এই বাড়িটি পরিচিত ছিল বাগানবাড়ি নামে। ১৯২১ সালে জেক লম্বাট নামক এক ইংরেজ ভদ্রলোক এটা নির্মাণ করেছিলেন। পাকিস্ড়ানি বাহিনী এটাকে দখল করে বানায় নির্যাতন কেন্দ্র। এই নির্যাতন কেন্দ্রে অনেক যুবতী নারীকে আটকে রেখে নিয়মিত ধর্ষণ করা হত। এখানে দুটি পাথর ছিল যেগুলো ছুরি ও রামদা শান দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হত এবং একটি বড় পাথরের উপরে শুইয়ে বাঙালিদের পশুর মত জবাই করা হত। এসব হত্যাকা"ের অন্যতম হোতা ছিল স্থানীয় অবাঙালিরা। মূলত পূর্ব পাকিস্ড়ানে অবাঙালিদের একটি বড় অংশ চাকরি করত রেলওয়েতে। তাই পাহাড়তলী পূর্ব থেকে অবাঙালি অধ্যুষিত ছিল।

বর্তমানে পাহাড়তলীকে দেখে বোঝার উপায় নেই ১৯৭১ সালে এখানে কী ঘটেছিল। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর অনিচ্ছা, অবহেলা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার আড়ালে হারিয়ে গেছে একাত্তরের বর্বরতার সাক্ষী পাহাড়তলী বধ্যভূমির নানা অংশ। হারিয়ে গেছে শত শহীদের রক্তে ভেজা এক গৌরবময় অধ্যায়। বর্তমানে এই বধ্যভূমির উপর নির্মিত হয়েছে ইউএসটিসির *জিয়া ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিসট্রেশন ভবন*। যার নির্মাতা বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত চিকিৎসক জাতীয় অধ্যাপক নুর"ল ইসলাম। ৫ মার্চ ২০১৪ প্রজন্ম'৭১ চট্টগ্রামের সভাপতি গাজী সালেহ উদ্দিন ও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের রিটের প্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ এই স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। যদিও এখনো সেটা কার্যকর হয়নি। বধ্যভূমির

আরেকটি অংশ ফয়েজ লেক, যেটাতে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের বদান্যতায় কর্নকড গড়ে তুলেছে তাদের প্রমোদ কেন্দ্র *কনকর্ড অ্যামিউজমেন্ট পার্ক*।

আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা চট্টগ্রামে। তাই অনেকটা দায়বদ্ধতা থেকে আমার এই কাজের শুর"। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ড় নিজেই জানতাম না এখানে কী ঘটেছিল। তাই আগামী প্রজন্মের কাছে পাহাড়তলী গণহত্যার বিবরণ, ঘাতকদের পরিচয় ও নৃশংসতার বর্ণনা তুলে ধারার নিরিখেই আমার এই প্রয়াস।

খুলনায় স্থাপিত **১৯৭১ ঃ** *গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট* যখন গণহত্যা নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা রচনার উদ্যোগ নেয় তখন আমি আমার দ্বিতীয় নির্ঘণ্ট হিসেবে *পাহাড়তলী গণহত্যা*কে বেছে নেই। আমার এই কাজে পুরানো পত্রিকা, স্মরণিকা ছবি ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডীন গাজী সালেহ উদ্দিন। ১০ নভেম্বর পাহাড়তলী গণহত্যায় শহীদ রেলওয়ে কর্মকর্তা আলী করিমের পুত্র গাজী সালেহ উদ্দিনের কল্যাণেই মূলত এই গণহত্যা ও বধ্যভূমি পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছে। প্রায় তিন দশক ধরে তিনি এই বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে কাজ করছেন। সহযোগিতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমাকে মাঠ পর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে সহায়তা করার জন্য ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও যুবক কমিশনের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম, খ্যাতিমান প্রকাশক আহমেদ মাহফুজুল হক ও আমার দুই সহকর্মী তপন পালিত ও আহম্মেদ শরীফ। তাদের সবাইকে আন্ড়রিক ধন্যবাদ। আমার এই গ্রন্থ রচনার পেছনে মূল উৎসাহদাতা, পরামর্শদাতা আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। স্যারের মত একজন অভিভাবকের ছায়াতলে থাকাটাই জীবনের বড় অর্জন। স্যারকে ধন্যবাদ জানানো কিংবা কৃতজ্ঞতা জানানোর সাহস আমার নেই। আমার দুই অগ্রজ মোরশেদ কাদের চৌধুরী ও খোরশেদ কাদের চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাই। তাদের উৎসাহ আমার কাজে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

সর্বোপরি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই পাহাড়তলী বধ্যভূমিতে নিহত প্রায় দশ হাজার শহীদদের, প্রায় এক হাজার বীরাঙ্গনাদের।

পৌষ ১৪২১ **চৌধুরী শহীদ কাদের**

shahidkcdu@gmail.com

ভৌগোলিক অবস্থান

পাহাড়তলী বধ্যভূমির অবস্থান চট্টগ্রাম শহরের খুলশী থানায়। পূর্বে এটি পাঁচলাইশ থানার অংশ ছিল। ২০০০ সালের ২৭ মে পাহাড়তলী ও পাঁচলাইশ থানার অংশবিশেষ নিয়ে খুলশী থানা গঠিত। ড. আব্দুল করিমের মতে, ফারসি খোলাসা শব্দ থেকে সম্ভবত খুলশী নামের উৎপত্তি। পাহাড় টিলা ও সমতল খোলামেলা জায়গার সমন্বয়েই

খুলশী গঠিত। বর্তমানে চট্টগ্রামের সবচেয়ে অভিজাত এলাকা খুলশী। পাহাড়তলী বধ্যভূমির অবস্থান খুলশী থানা থেকে একটু সামনে বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম কার্যালয় ও ইউএসটিসির বিপরীত পাশে। এলাকাটি ফয়েজ লেক নামেই পরিচিত। মূলত ফয়েজ লেক বর্তমানে যেটা *কনকর্ড অ্যামিউজমেন্ট পার্ক* পাহাড়তলী বধ্যভূমিরই একটা অংশ। আর পাহাড়তলী বধ্যভূমির মূল অবস্থান যেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউএসটিসির বিজনেস ফ্যাকাল্টি নির্মিত হচ্ছে।

ফয়েজ লেক একটি কৃত্রিম লেক। কয়েকটি পাশাপাশি বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বাঁধ দিয়ে এই লেক তৈরি করা হয়েছে ইংরেজ আমলে। মূলত পাহাড়তলীতে অবস্থিত রেলওয়ে আবাসিক এলাকার পানীয় সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই কৃত্রিম লেক তৈরি করা হয়েছিল। এই লেকের পরিকল্পনাকারী রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মিস্টার ফয় এর নামানুসারে পরবর্তীকালে এর নাম ফয়েজ লেক হয়েছে বলে আব্দুল হক চৌধুরী *বন্দর শহর চট্টগ্রাম* গ্রন্থে উলে- খ করেছেন।

খুলশী থানার অধীনে পূর্ব পাহাড়তলী মৌজায় অবস্থিত এই বধ্যভূমির বি. এস দাগ নং ১৫২ ও ১৫৩ মোট আয়তন ১.৭৫ একর। এই বধ্যভূমিতে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের অধিকাংশেরই আবাস ছিল পার্শ্ববর্তী শহীদ লেন (পাঞ্জাবী লেন), মাস্টার লেন, গোয়ানিজ কোয়ার্টার, সরাইপাড়া, ওয়ারলেস, ঝাউতলা এলাকায়। এসব এলাকায় বসবাসকারীদের একটি বড় অংশ রেলওয়েতে চাকরি করত। পাকিস্ড়ান রেলওয়েতে বিপুল সংখ্যক অবাঙালি চাকরি করতেন। এরাও বাস করতেন এসব এলাকায়। মূলত ঝাউতলা, শেরশাহ কলোনী, ফিরোজশাহ কলোনী ও ওয়ারলেস এলাকায় তাদের বসবাস ছিল সবচেয়ে বেশি। পূর্বে বিহারি-বাঙালি সম্প্রীতি বজায় রেখে চললেও একাত্তর সালে বিহারিরা ভয়াবহ রকমের নির্যাতন, লুট ও অত্যাচার করেছে পাড়া প্রতিবেশীদের ওপর।

বর্তমানে ক্রমবর্ধমান নগরায়নের প্রভাবে এসব এলাকার চেহারা পালটে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের পর স্বজনহারানো অনেক পরিবার শহর ছেড়ে চলে যায়। বিশেষ করে রেলওয়েতে চাকরি করত চট্টগ্রামের বাইরের এমন অনেক পরিবার এখানে বাস করত। মুক্তিযুদ্ধে পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটির মৃত্যু হলে তাদের পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব হয়নি। একমাত্র শহীদ লেন ও মাস্টার লেনে একাত্তরে নির্যাতিত ভুক্তভোগী ও স্বজনহারানো পরিবারগুলোকে দেখতে পাওয়া যায়।

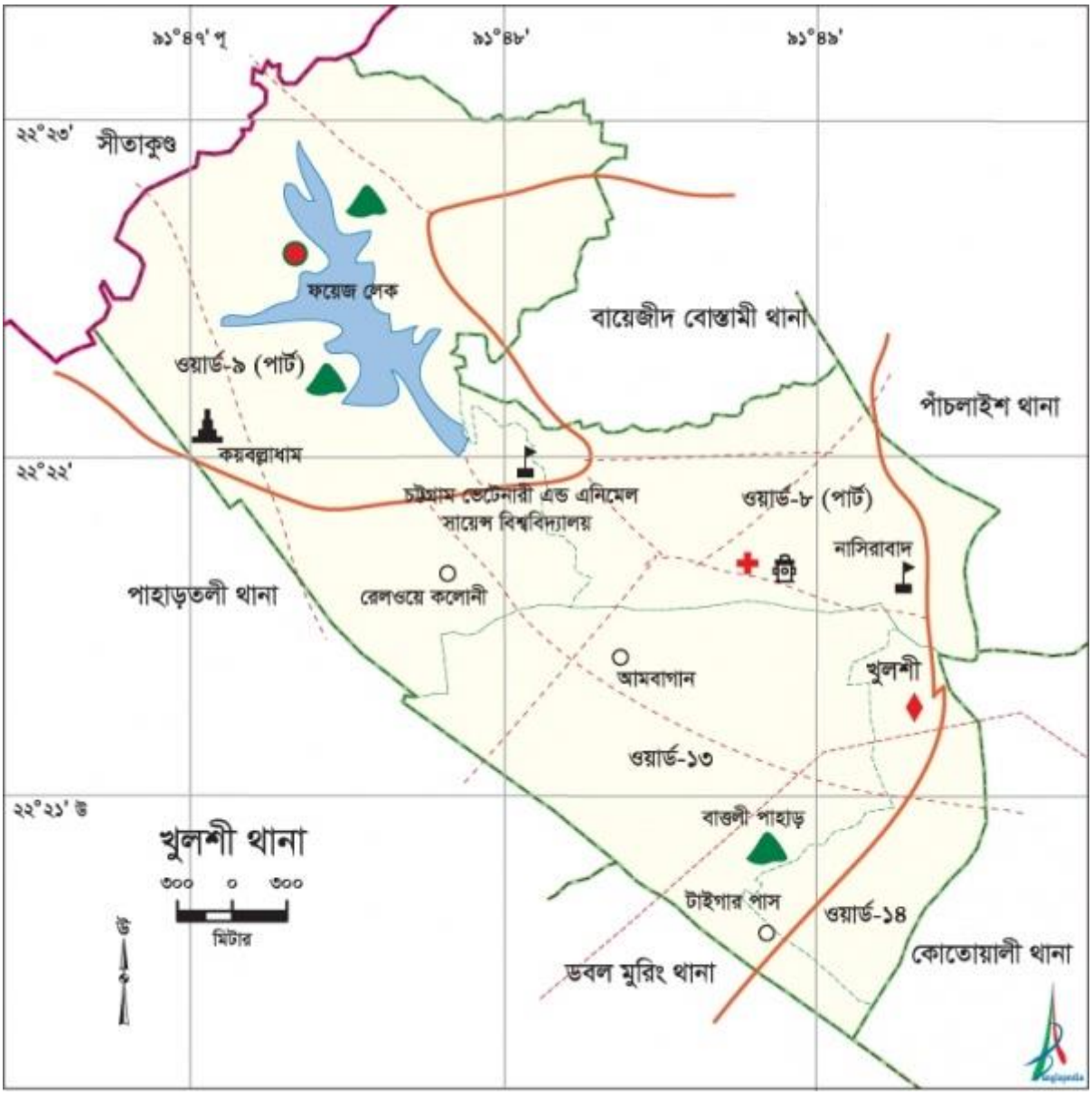

খুলশী থানার মানচিত্র *সৌজন্য বাংলাপিডিয়া*

গণহত্যার পটভূমি

পাহাড়তলী প্রীতিলতার রক্তের উপর বিকশিত হয়েছে। ১৮৬২ সাল থেকে তৎকালীন তেজী ছাত্রনেতা ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীর উদ্যেগে এ অঞ্চলে আন্দোলনের জোয়ার উঠেছিল। সামরিক শাসক বিরোধী শিক্ষা আন্দোলনে পাহাড়তলী অঞ্চলে মোঃ ইউনুছ খান, তৈয়বুর রহমান, মুস্ড়াফিজুর রহমান দুলাল, নান্নু বাহার, মোঃ শফি, সর্দার সিরাজ প্রমুখ ভূমিকা রেখেছিলেন। মেয়েদের নেতৃত্বে ছিলেন মেহের ন্নেসা আনার, আসমা খাতুন, আবেদা সুলতান, ফিরোজা বেগম, র নু, শিরিন, মিনু প্রমুখ।

ছয়দফা থেকে সত্তরের নির্বাচন পর্যন্ড় পাহাড়তলী অঞ্চলের ছাত্ররা চট্টগ্রামে আন্দোলনের অন্যতম শক্তি ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম সাবের আহমেদ আজগরি, সোহরাওয়াদী, ডাঃ মাহফুজুর রহমান, ফাহিদ উদ্দিন আহমদ, গোলাম মুর্তজা, সাফায়েত কাওসার, মালিক হাসান, মফিজুল হক ভূইয়া, মোঃ শফি, সালাহউদ্দিন হায়দার, আবদুর রাজ্জাক, খায়র"ল ইসলাম, কামাল, মতি, হুমায়ুন, খায়র"ল ইসলাম, আবুল কাশেম মঞ্জুর, আনোয়ার, সফি, রওশন আরা বেগম, মমতাজ, সুফিয়া, রাফিয়া, বেবী, তোফা, লাকী, জুয়েল, নাজমুল, বাহার, গাজী মেজবাহ উদ্দিন নান্নু, ওয়ালিউর রহমান প্রমূখ। এদের ক'জন মহান মুক্তিযুদ্ধে পালন করেন ঐতিহাসিক ভূমিকা।

মার্চের শুর" থেকে পাহাড়তলীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুর" হয়। বিহারীরা ৩ মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের শুর"তে বাঙালিদের উপর হামলা চালায়। এদিন সকাল সাড়ে সাতটায় ছাত্রলীগের একটি মিছিল ডিজেল কলোনি, টিকেট প্রিন্টিং প্রেস, ওয়ারলেস কলোনি, ঝাউতলা প্রদক্ষিণ করে সেগুনবাগানের ভিতর দিয়ে পাহাড়তলী রেলওয়ে স্কুলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ওয়ারলেস কলোনির মধ্য দিয়ে যাবার সময় মিছিলকারীরা উর্দু সাইনবোর্ডগুলি নামিয়ে ফেলে। একটি আরবি সাইনবোর্ডকে উর্দু মনে করে নামাতে গেলে বিহারিদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। মিছিলে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুস সফিক চৌধুরী (বাচ্চু), আশরাফুল করিম বাদল, আবদুল কাইয়ুম, রফিকুল আলম, ফজলে এলাহী, আবু জাফর, বশর, আজিজ, খুরশীদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের হস্ড়ক্ষেপের ফলে কোন অঘটন ছাড়াই মিছিলটি উক্ত স্থান অতিক্রম করে। ঠিক একই সময়ে আর একটি মিছিল আওয়ামী লীগের পাহাড়তলী শাখার সভাপতি খলিল সওদাগর ও মঞ্জুর নেতৃত্বে সরাইপাড়া থেকে যাত্রা শুর" করে পাহাড়তলী রেলওয়ে স্কুলের সামনে দিয়ে ওয়ারলেস কলোনির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ দুটি মিছিল সেগুনবাগান কলোনির মাথায় একত্রিত হয়ে আবার ওয়ারলেস কলোনিতে ফিরে যায়।

১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণায় পাহাড়তলীর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ করে জঙ্গী মিছিল বের করে। এই মিছিলে পাহাড়তলী, ঝাউতলা, আমবাগান, পাঞ্জাবী লেনের স্কুলের ছেলেমেয়েরা এবং এলাকার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেয়। পাহাড়তলী তখন ছাত্রলীগের শক্ত ঘাঁটি। মুস্ড়াফিজুর রহমান, মাহফুজুর রহমান, সাবের আহমদ আসগরী, আবদুস সফিক চৌধুরী, আবদুল কাইয়ুম ছিলেন ছাত্রলীগের সম্মুখ সারির নেতা। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল ডাকে, তারই সমর্থনে পাহাড়তলীতে ওই খ" খ" মিছিল হচ্ছিলো। ডিজেল কলোনি ও সরাইপাড়া থেকে আগত দুটি মিছিল একত্রিত হয়ে বর্তমান পাহাড়তলী কলেজের সামনের একটি লাকড়ির দোকান ও চায়ের দোকান থেকে উর্দু সাইন বোর্ড নামাতে গেলে বিহারীরা মিছিলের উপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়।

পূর্বে প্রস্ড়ুত বিহারীরা দা, তলোয়ার, লাঠি নিয়ে মিছিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের মারধর করে। মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পলিটেকনিকের কয়েকজন অংশগ্রহণকারী সরাইপাড়ায় ফিরে আসে এবং কেউ

কেউ আটকা পড়ে। স্থানীয় বাঙালিরাসহ প্রতিরোধের চেষ্টা করে কিন্তু লাভ হয় না। কারণ, বিহারীদের কাছে তলোয়ার, রামদা, কুড়াল, বল- মসহ অন্যান্য অস্ত্র পক্ষান্ড়রে বাঙালিদের অস্ত্র ছিল রাস্ড়ার পাথর, ভাঙ্গা ইট ও লাঠি। এদিকে খবর ছড়ায় যে, খলিল সওদাগরসহ অনেক বাঙালিকে বিহারীরা মেরেছে এবং আটকিয়ে রেখেছে। এর মধ্যে সিটি কলেজের একজন ছাত্রকে হত্যা করা হয়, আটককৃত বাঙালিদের উদ্ধারের জন্য পলিটেকনিকের ছাত্ররা পোল্ট্রি ফার্মের দিক দিয়ে সরাইপাড়া ও পাহাড়তলীর লোকজন এক্স ই এন অফিসের পাশ দিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে বিহারী ও বেলুচ বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে মিছিল অগ্রসর হতে পারে না। পাকিস্ড়ানি বেলুচ সৈন্যরা সরাসরি মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করে। এতে ঘটনাস্থলেই দুইজনের মৃত্যু হয় (বর্তমান পাহাড়তলী কিন্ডার গার্টেন স্কুলের সামনে দিয়ে যে রাস্ড়া পাহাড়ের দিকে উঠেছে সেখানে বাদাম গাছের নীচে)। পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীর বেলুচ রেজিমেন্টের একটি দল ওয়ারলেস অফিসে আগে থেকেই অবস্থান করছিল। বিহারীদের সাথে সাদা পোশাকে অনেক সামরিক বাহিনীর লোকজন ছিল যাদের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র দেখা গিয়েছে। সৈন্য বাহিনীর প্রশ্রয় পেয়ে তারা আরও মারমুখী হয়ে উঠে। বড় বড় তলোয়ার, বন্দুক, রামদা, কিরিছ, লাঠি নিয়ে বাঙালিদের মারধর শুর“ করে। ওয়ারলেস কলোনীতে যেসব বাঙালি বসবাস করতো তাদের উপর হামলা শুর“ হয়। সেগুনবাগান ইলেকট্রিক সাবস্টেশনের পাশে দুজন বিহারী একজন বাঙালি যুবককে ছুরি মেরে হত্যা করে। এইসব আহত বাঙালিদের উদ্ধার ও চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হতে দুটি বাস বোঝাই চিকিৎসক দল (মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের দ্বারা গঠিত) পোল্ট্রিফার্মের দিক দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করলে বেলুচ রেজিমেন্ট দ্বারা বাধাগ্রাস্ড় হয়। এই দলের সাথে তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা সাবের আহমদ আসগরী ছিলেন। বিহারীরা তাকে তাড়া করে। তিনি কমিশনার খালেকের বাসার পিছন থেকে চাদরমুড়ী দিয়ে পালিয়ে যান। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সকাল ১০ টার দিকে কয়েকজন যুবক নিউ পাঞ্জাবী লেনের কাচা ঘরে আগুন লাগিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। নিউ পাঞ্জাবী লাইনে এক কামরা বিশিষ্ট অনেকগুলি রেলওয়ের বাসা ছিল। এইসব ঘরে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা বসবাস করতো। আর যেসব পতিত জমি রয়েছে সেখানে কাঁচা ঘর তুলে ভাড়া দিত। এই সব কাঁচা ঘরে ইস্পাহানী মিলের কর্মচারী, রিক্সাওয়ালা, রেলওয়ে কর্মচারীবৃন্দের আবাসস্থান ছিল। তবে বেশির ভাগ এলাকার অবৈধ দখলদার ছিল বিহারী। আগুন লাগাবার ফলে প্রায় ৩০০ কাঁচাঘর পুড়ে যায়। বাঙালি পরিবার পাঞ্জবী লেনেও (বর্তমান শহীদ লেন) বিহারীরা ফিরোজশাহ কলোনীতে আশ্রয় নেয়। পাঞ্জাবী লেনে রফিকের সামনেই বিহারীরা এক বাঙালিকে মেরে জলন্ড় অগ্নিকুে নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় উত্তেজিত বাঙালিরা লোকোসেড কলোনীতে অবস্থানরত বিহারীদের মধ্যে ২-৩ জনকে হত্যা করে। স্থানীয় লোকজনের আক্রমণ থেকে বিহারীদের রক্ষা করার জন্য রেলওয়ে কর্মচারীরা অনেক বিহারীকে ঘরের মধ্যে আলমারী ও গুপ্তস্থানে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করে। মেডিকেল কলেজ থেকে আহত ব্যক্তিদের নিতে এলে অ্যাম্বুলেন্স করে বিহারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটে। পাঞ্জাবী লেনে কবরস্থানের সামনের রাস্ড়ায় একজন বিহারীকে বেদম প্রহার করা হয়। পলিটেকনিক্যালের ভিপি আবদুল- াহ আল হার ্নসহ অনেকে ওয়ারলেস কলোনীর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিরোধ ও আগুনের জন্য কলোনীতে ঢুকতে ব্যর্থ হয়। সকাল ১১টার দিকে ইপিআর আসে কিন্তু তারাও ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে এই দাঙ্গার কথা দাবালনের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

রেল কর্মচারী ফজলুল করিম ওয়ারলেস কলোনীতে বন্ধুর বাসায় পরামর্শ করতে এসেছিলেন কখন কীভাবে গ্রামের বাড়ি চলে যাওয়া যায়। বাইরে হট্টগোল শুনে তিনি বাইরে বের হয়ে দেখতে পান বিহারীরা দা, কুড়াল, তলোয়ার, বন্দুক, বল- ম নিয়ে ওয়ারলেস কলোনির মোড়ের দিকে ছুটছে। করিম ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে গেলেই ৫নং রাস্ড়ার মাথায় আক্রান্ড় হন। বিহারীরা তাকে প্রচ ্ড প্রহার করে মৃত ভেবে ড্রেনে ফেলে দেয়। বিহারীরা চলে গেলে তিনি ড্রেন থেকে সম্পূর্ণ দিগম্বর অবস্থায় এক্স.ই.এন কলোনীতে ফিরে যান। সহকর্মীরা ঐ দিনই তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়।

৩ মার্চ বিকেল ৩টার দিকে বিহারীরা সংঘবদ্ধ হয়ে সেগুনবাগান এলাকা থেকে বাঙালি পুর ্ষদের ধরে মারতে মারতে রেলওয়ের সি.এম.ই আশফাকের বাসা সংলগ্ন (বর্তমানে বিনোদন ক্লাব) আউট হাউসে জড়ো করে। আউট হাউস ও মাঠে বসিয়ে প্রত্যেককে লাথি, ঘুষি, চড়, লাঠি, বেত দিয়ে প্রহার করতে থাকে। এখানে প্রায় তিনশত বাঙালির মধ্যে দেলোয়ার হোসেন, ওয়ারলেস কলোনির শিক্ষক সাহাদৎ হোসেন, কমিশনার সেকান্দর মিয়া, কমিশনার নূর নবী, ডি.সি.ও.এস. এম.এ করিম, সুলতান আহমদ, আবদুর রশিদসহ আরো অনেক ছিলেন। সন্ধ্যা সাতটার দিকে সামরিক বাহিনীর হস্ড়ক্ষেপের ফলে এরা ছাড়া পায়।

এরপর পুরো মার্চ মাস জুড়ে বেশ কয়েকবার বিহারী-বাঙালিদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। তবে স্থানীয় আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগের সমঝোতার কারণে বড় ধরনের কোন সংঘর্ষ হয়নি।

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ২৫ মার্চ রাতে যখন সেনাবাহিনীতে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করা হচ্ছিল, অনেকে পালিয়ে তখন পাহাড়তলীতে আশ্রয় নেয়। ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে তারা খুব সহজে ফয়েজ লেক হয়ে বেরিয়ে যায়। তবে পালিয়ে আসা এসব সৈন্যদের বেশিরভাগই ছিল নতুন রিক্রুট এবং তাদের কাছে তেমন কোন অস্ত্র ছিল না। তবে ছিল প্রবল মনোবল ও উদ্যম। এছাড়া ঝাউতলাতে ছিল চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাম্প। পাকিস্ড়ান রিজার্ভ পুলিশের একটি ইউনিট সিডিএ মার্কেট এলাকায় ছিল। তাদের সাথে স্থানীয়দের বেশ

সুসম্পর্ক ছিল। পাহাড়তলী পুলিশ বিটের সদস্যদের সাথেও এলাকাবাসীর ভালো যোগাযোগ ছিল। ২৬ মার্চ সকালে ক্যাপ্টেন এম.এস. এ ভূঁইয়া পাহাড়তলীতে এসে পৌঁছান। সকলের মনোবল বেড়ে যায়। ইতোমধ্যে বিহারীদের আক্রমণের ভয়ে পাহাড়তলীর ওয়ারলেস, পাঞ্জাবী কলোনীতে স্থানীয়রা পাহারা দেয়া শুর“ করে। বিকেলে পাহাড়তলী পুলিশ বিটের সার্জেন্ট বদর“দ্দোজা জানালেন, বিটে রক্ষিত ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন একদল বাঙালি সৈন্য পশ্চিম পাকিস্ড়ান থেকে পালিয়ে আগরতলা হয়ে চট্টগ্রামের দিকে আসছে। অন্যদিকে শুনা যাচ্ছিল ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীর একটি রেজিমেন্ট চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়েছে। ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার নেতৃত্বে প্রায় ৭০-৮০ জন সৈন্য ময়নামতি থেকে আগত পাকিস্ড়ানি রেজিমেন্টকে প্রতিহত করতে কুমিল- ার দিকে অগ্রসর হয়। পাঁচটি ট্রাকে করে জয়বাংলা শে- াগান দিতে দিতে তারা রওনা দেয়। স্থানীয়রা তাদেরকে হাত নেড়ে বিদায় জানায়।

সিডিএ মার্কেটের রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী থেকে যায়। তারা ২৬ মার্চ রাতে স্থানীয়দের অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দিতে শুর“ করে। সিদ্ধান্ড় হয় প্রতিদিন তারা বিভিন্ন ব্যাচে স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ দিবেন। কিন্তু সেই রাতেই চট্টগ্রাম শহর জুড়ে শুর“ হয় পাকিস্ড়ানি বাহিনীর তা™বলীলা। রিজার্ভ বাহিনীর সকল পুলিশ সদস্য অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়। পাশাপাশি শুর“ হয় স্থানীয়দের শহর থেকে পালিয়ে যাওয়া। ২৭ মার্চ পাহাড়তলীসহ পুরো চট্টগ্রাম হয়ে পড়ে মূলত গুজবের শহর। ভয়ে আতংকে দিন কাটাচ্ছিল শহরবাসীরা। তবে সীতাকু“ের কুমিরায় বাঙালি সৈন্যদের ও স্থানীয়দের সাথে পাকিস্ড়ানি বাহিনীর প্রতিরোধ যুদ্ধের বেশ কিছু সংবাদ তাদের কাছে আসছিল। ২৮ মার্চ পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীর ময়নামতি রেজিমেন্ট চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশ করে। তারা ইস্পাহানি
পাহাড়ের উপর ঘাঁটি স্থাপন করে এবং ২৯ মার্চ ইস্পাহানি মিলের পাহাড় ও পতেঙ্গার যুদ্ধ জাহাজ থেকে হালিশহর আর্টিলারী সেন্টারে গোলা বর্ষণ করা হয়।

৪ এপ্রিল পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনী ওয়ারলেস কলোনির উত্তরে পুরনো মসজিদের পাশে ক্যাম্প করে। সেগুন বাগানে অনেক পরিবারের মধ্যে পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কসপের কর্মচারী মুহাম্মদ মহিউদ্দিন খানের পরিবার আটকা পড়ে। মহিউদ্দিন মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিহারিদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিল। তিনি কল্পনায়ও ভাবতে পারেননি যাদের আপন ভেবেছেন তারাই তার কাল হবে। তার সহকর্মী নূর মোহাম্মদ তার এক আত্মীয়কে নিয়ে কলোনীতে প্রবেশ করে অন্যান্য বাঙালিদের পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁরা ৭ নং রোডে প্রবেশ করতেই বিহারী আলী আকতার গামা, জসিম খান, নাটো, খুরশীদ, আপুয়া, ঈসা, ইউনূস, কাইয়ুম চার্জম্যানসহ তাদেরকে ধরে ফেলে এবং দু'জনকেই ড্রেনের পাশে জবাই করে হত্যা করে।

এপ্রিলের সাত তারিখ বিবিসি শোনার জন্য সবাই রাস্ড়ায় জড়ো হয়। এর মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এস. কে. সিং নামে ব্যারেজ সপের একজন কর্মচারীও ছিলেন। অবাঙালি গামা এস কে সিংকে ডেকে রাস্ড়ার পাশে নিয়ে গিয়ে কিছু বুঝে উঠার আগেই হঠাৎ করে তার তলপেটে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করতে থাকে। সিং কখনো বাংলায় কখনো উর্দুতে চিৎকার করে বলতে থাকে 'গামা আমাকে মেরে ফেললো', 'গামা হামকো মার ডালা', 'কৌই

হ্যায় হামকো বাঁচাও', 'হাম ক্যায়া কিয়া'। কিন্তু তার ডাকে কেউ এগিয়ে যায় নি সেদিন; সবাই তাড়াতাড়ি নিজ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আবার কেউ কেউ রাস্ড়ায় দাঁড়িয়ে এই হত্যাকা"টি অবলোকন করতে থাকে। গামা তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়, আহত সিং পেট চেপে ধরে শুয়ে শুয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিলেন। তার চিৎকার নীরব সন্ধ্যাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিতে থাকে। গামা এই মৃত্যুপথযাত্রীকে টেনে হিঁচড়ে ড্রেনের পাশে নিয়ে যায়। ড্রেনের ভিতর মাথা রেখে কপাল বাম পা দিয়ে চেপে ধরে কণ্ঠনালীর উপর ছুরি চালায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে; সিং খুবই শক্তিশালী ছিলেন, গলা থেকে ঠিকই আওয়াজ বের হতে থাকে। গোঙানির আওয়াজ মনে হচ্ছিল যেন ভূমিকম্প হচ্ছে, সারা বাড়িঘর কাঁপছে। তার আওয়াজ পূর্বের চেয়ে আরও বেড়ে যায়। গামা এই সময় চার্জম্যান কাইয়ুমের সাথে কথা বলছিল। আওয়াজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলে 'শালা আবি তাক নেহী মরা' এই বলে দৌড়ে এসে হাতের ছুরি দিয়ে পেট আড়াআড়িভাবে ফেঁড়ে ফেলে, সাথে সাথে ফুস করে জোরে আওয়াজ বের হয়ে চিরদিনের জন্য এস কে সিং নীরব হয়ে যান। গামা ছুরিটি লাশের উপর মুছে কোমরে গুজে রাখে।

মুহাম্মদ মহিউদ্দিন খানের পরিবার ভয়ে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে আল- াহকে ডাকতে থাকে ও দোয়া দর"দ পড়তে থাকে। রাত আনুমানিক ৮টার দিকে বিহারীরা তার পরিবারের উপর আক্রমণ করে। প্রথমে তারা তার পুত্র দেলোয়ার হোসেনকে খোঁজ করে। দেলোয়ার চৌকির নিচে লুকিয়ে থাকাতে তারা দেখতে পায় নি। ২০-২৫ জন বিহারি লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে খান সাহেবকে টেনে হিচঁড়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায়, রাস্ড়ার উপর নিয়েই তাকে ছুরিকাঘাত করে। তার স্ত্রী কন্যাপুত্ররা শুধু একটি আর্তচিৎকারই শুনেছে। কাইয়ুম চার্জম্যানের (৭৬৯ বি) বাসায় নিয়ে জবাই করে রাত ১১টার দিকে কয়েকটি ঠেলাগাড়িতে করে অনেকগুলি লাশ নিয়ে আমবাগান রেললাইনের পাশে বড় ল্যাট্রিনে ফেলে দেয়। এসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অব স্টোরস এল আর খান, সিনিয়র একাউন্টস অফিসার মোহাম্মদ আবদুল হামিদ এবং সিনিয়র ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মোজাম্মেল হক চৌধুরী এই তিনজনের পরিবার সিদ্ধান্ড় নেয় তারা আপাতত পাহাড়তলী ত্যাগ করবে না। কারণ প্রথমত মাসের শেষ, দ্বিতীয়ত: এতগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে অনিশ্চিতের পথে যাত্রা হয়তো শুভ হবে না, তৃতীয়ত: তাদের বাংলোগুলি বিহারি অধ্যুষিত এলাকা ও নীরব এলাকা বলে বাঙালিরা দলে দলে যে শহর ছাড়ছে তা তাঁরা বুঝতে পারেনি, চতুর্থত: এই তিনটি পরিবারের কাছে ডবল ব্যারেল বন্দুকসহ মোট ১১টি বৈধ অস্ত্র ছিল, তাই তারা সিদ্ধান্ড় নিয়ে মোজাম্মেল হক সাহেবের বাংলোয় থাকা শুর" করেন। অস্ত্র থাকাতে তাদের সাহস ছিল, কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

ডি.সি.ও.এস এম.এ করিম এবং সি.পি.ও নাসিরউদ্দিন শহর ত্যাগ করার সময় এই তিন পরিবারকে এলাকা ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু চৌধুরী সাহেব সাহস যোগান, বিহারিদের সাথে তার সম্পর্ক আছে, তাছাড়া পাশে ইউপি'র ইঞ্জিনিয়ার ওয়ারেস রয়েছেন। ৫ জন পুর"ষ সদস্য, ৬ জন কাজের লোক, ১১ জন মহিলাসহ মোট ২২ জন চৌধুরী সাহেবের বাসায় আশ্রয় নেয়।

পাকিস্ড়ানি বাহিনী সরদার বাহাদুর স্কুল ও ওয়ারলেস অফিসে ক্যাম্প করার পর অস্ত্র জমা দেওয়ার ঘোষণা দেয়। ৫ এপ্রিল খুব সকালে বিহারিরা চৌধুরী সাহেবের বাসায় গিয়ে অস্ত্র তাদের হাতে হস্ড়ান্ড়র করার জন্য চাপ দিতে থাকে। মিসেস হামিদ অস্ত্র তাদের হাতে হস্ড়ান্ড়র করার পরামর্শ দেন। তাঁর ধারণা অস্ত্র পেলেই বিহারিরা চলে যাবে। হামিদ কিছুতেই অস্ত্রগুলি হাতছাড়া করতে চাচ্ছিলেন না। গেট বন্ধ থাকার ফলে ঘরে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। কাজের ছেলে পাশের বাসায় পানি আনার জন্য দরজা খুলতেই ঘাপটি মেরে বসে থাকা ঘাতকরা জোর করে ঘরে প্রবেশ করে। বিহারিরা ঘরে ঢুকেই ত্বড়িৎ গতিতে মিসেস এল আর খান, তার মেয়ে লতিফা আকতার, জেসমিন খান, মিসেস আব্দুল হামিদ, তাঁর ৫ মেয়ে ফরিদা আকতার এমিলি, শিরি হামিদ, সাইদা হামিদ, নাহিদা হামিদ, ওয়াহিদা হামিদ এবং নিঃসন্ড়ান মিসেস মোজাম্মেল হক চৌধুরীকে বেডর"মে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেয়। বিহারিরা মোঃ আবদুল হামিদ ও তাঁর চট্টগ্রাম কলেজে আই.এ পড়ুয়া ছেলে সাদেকুর রহমান বাবু, এল.আর. খান, তাঁর কমার্স কলেজে পড়ুয়া ছেলে জাহিদুর রহমান খান (শামীম) ও ছয়জন বাসার কর্মচারী, ১০/১১ বছরের ছেলে হাবিব, মুজিবর, শফি, জাবেদ আলী এবং আরও দু'জনসহ মোট এগারো জনকে দ্র"ত বিভিন্ন র"মের দিকে নিয়ে যায়, সাথে সাথে জবাই করে হত্যা করে এবং বুক ফেড়ে দেয়। এই পেশাদারী খুনীরা এত নিষ্ঠুর ও পরিকল্পিতভাবে হত্যাকা"টি চালায় যে, পাশের র"মের বন্দী মহিলারা গোঙানি ছাড়া কোন শব্দই শুনতে পায় নি। এল আর খান পাশের বাসায় পালাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওয়ারেস সাহেবের সিঁড়ির গোড়ায় ধরে তাকে জবাই করে ঘাতকরা। সাদেকুর রহমান বাবু ঘাতকদের হাত থেকে ছুটে দেওয়াল টপকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আশফাকের বাসায় তার ছেলের কাছে আশ্রয় চায়। ঘাতকরা তাকে খুঁজতে এলে বাবুর বন্ধু আশফাকের ছেলে তাকে ধরিয়ে দেয়। বিহারিরা আশফাক সাহেবের বাংলোর সামনেই তাকে হত্যা করে।

হামিদকে ধরে নিয়ে যাবার সময় তিনি মেয়েদেরকে সাথে বে- ড রাখার পরামর্শ দিয়ে যান, মেয়েদের সাথে অশালীন আচরণ করতে এলে যেন বে- ড দিয়ে কণ্ঠনালী কেটে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। দুপুর বারটার দিকে বিহারিরা যুবতী মেয়েদের আলাদা করার চেষ্টা করে, মিসেস হামিদ ও মিসেস খানের প্রতিরোধের মুখে ফিরে যায়। বিহারীরা তিন পরিবার থেকে প্রায় ৪০-৫০ ভরি স্বর্ণ নিয়ে নেয়। ছোট ছোট মেয়েরা তাদের গায়ের সকল গহনা খুলে দিয়ে আকুতি মিনতি ও কান্নাকাটি করে তাদের বাবা-ভাইকে ফেরত এনে দিতে। ১২ টার পর স্কুল বাসের ড্রাইভার আয়ুব এসে সবাইকে তার বাসায় নিয়ে যায়। র"ম থেকে বের হবার পর দেখতে পায় সারা ঘরে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। লাশগুলি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই গণহত্যার নীল নকশা তৈরি করেছিল সিগনাল ইঞ্জিনিয়ার বিহারি ইউসূফ।

সি.পিও নাসিরউদ্দিন হাটহাজারীতে একটি গ্রামে লুকিয়ে থেকেও এই ঘাতকদের হাত থেকে রেহাই পান নি। টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে তিনি ব্যাংকের সি আর বি শাখায় বাহক মারফত একটি চেক প্রেরণ করেন।

এই চেকের সূত্র ধরে বিহারি ও পাকিস্ড়ানি বাহিনী সে গ্রামে উপস্থিত হয়ে নাসিরউদ্দিনকে গুলি করে হত্যা করে।

১০ নভেম্বর

১০ নভেম্বর ১৯৭১, ২০ রমজান বুধবার পাহাড়তলীর ইতিহাসে কলঙ্কিত দিন। সেদিন খুব ভোরে পাঞ্জাবী লেন থেকে কজন মুসলি- বের হয়ে এসেছেন মসজিদ থেকে। সবাই বাসায় ফিরছিলেন। পথেই দেখা একজন অবাঙালির সাথে। সে অভিযোগ করল, মসজিদের পূর্বদিকে পাহাড়ের কিনারে সমতল জায়গায় চারজন বিহারীকে বাঙালিরা মেরে ফেলে রেখেছে। অপরিচিত বাঙালি লোকটা বলল, 'কলোনী কা হালত খারাপ হো যায়গা'। সে মুসলি- দের লাশ চারটা দেখার জন্য বলল, এ লোকটির কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য এগিয়ে গেলেন মুসলি- রা। মুসলি- দের মধ্যে ছিলেন এ কে এম আফছার উদ্দিন, আকবর হোসেন, আবদুল গফুর ইয়াজদানি, মোঃ মোতাহের্র রহমান ও মসজিদের মুয়াজ্জিন। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী রাস্ড়া পার হয়ে তারা যখন খোলা জায়গায় গেল, সেখানে অগণিত অবাঙালি নানা রকমের মরণাস্ত্র নিয়ে লাশগুলোর আশে পাশে দাড়িয়ে আছে এবং অসংখ্য লোক পূর্বদিক থেকে এদিকে শোরগোল করে অগ্রসর হচ্ছে। তারা চিৎকার করে বলছে, খতম করো। এই অবাঙালি অস্ত্রধারী লোকদের অধিকাংশই রেলওয়ে কর্মচারী। পাহাড়তলী লোকোসেডের বয়লার মেকার আকবর চিৎকার করে বলল, 'ইহাছে ভাগো শালা বাঙালি লোক'। এরপর অনেকে সমস্বরে চিৎকার করে বলল, 'ভাগনে মত দাও, খতম কর'। ইউনিয়ন কাউন্সিলর চেয়ারম্যান ইউসূফ, রিটার্ড অফিস সুপারিনটেনডেন্ট হামিদ হোসেন, রেলওয়ের ড্রইং সেকশনের ইফতিখার উদ্দিন ও জিয়াউল হক অস্ত্র হাতে তাদের গালি গালাজ করল। ভয়ে তারা কোন রকমে পালিয়ে এল পাহাড়তলী পুলিশ ফাঁড়িতে। ফাঁড়িতে এসে তাঁরা পুলিশের সাহায্য চাইল। কিন্তু তারা কোন সাহায্য করতে পারল না। সেখানে থেকে ডবলমুরিং থানায় ফোন করা হল। তারাও কোন সাহায্য করল না।

নির্পায় হয়ে আকবর হোসেন তার পরিবার এবং ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ ব্যস্ড় হয়ে পুলিশ ফাঁড়ি হতে বাসার দিকে রওনা হলেন। বাসায় এসে স্ত্রীকে বলল, তিনি বড় ছেলের সাথে (মুক্তিযোদ্ধা) দেখা করতে যাবেন। এই কথা বলে বাসা থেকে বের হতেই ঘরের সামনে থেকে বিহারীরা তাকে আবার ধরে নিয়ে যায়।

পাঞ্জাবী লেন, মাস্টার লেনের ১২ বছরের বেশি বয়সের সকল পুর্ষের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় জল- াদখানায়। অনেকে আবার ধোঁকায় পড়ে সহজ ও সরলভাবে জল- াদখানার দিকে চলে গেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. গাজী সালেহ উদ্দিনের বাসা থেকে আবদুল গোফরান, আবদুল মান্নান ও গাজী কামাল উদ্দিনকে ধরে পাহাড়তলী গার্লস স্কুলের মাঠে জড়ো করে ঘাতকরা। কামাল ড্রেনের ভিতর দিয়ে পালিয়ে আসে। কলোনি থেকে কাশেম, গোলাম ইয়াজদানী, গোলাম হোসেন চৌধুরী, আবদুল খালেক, আহমদ আলী মোড়ল, মোসলেম আলী তালুকদার, আলী আজম মুন্সী, সুলতান, আবুল হাশেম, মাহতাব রহমান, সৈয়দুর

রহমান, কাজী মাহবুব ইয়াজদানী, আনাসার আলী, হায়দার আলী, জুনাব আলী, ফজল মিয়া, মোঃ জয়নাল আবেদীন, সিরাজ আলী নওয়াব, সরফত আলী, মোঃ ফসিউল আলম, কাজী নজর ল ইসলাম, নুর ল হক, আবদুল মান্নান, আবদুল হামিদ, মমতাজ মিয়া, মোঃ আকবর হোসেন, ওজিউল- াহ, কফিল উদ্দিন, আবুদল মজিদ, মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ নজীর আহমদ, কবির আহম্মদ, মোঃ নুর ল হক, মোয়াজ্জেম, আবদুল মান্নান, সৈয়দ আমীর আলী, আলী হোসেন, আবদুল গোফরান, আবদুল আজিজ, শামসুল হক, আবদুল করিম, আবদুল ওয়াহাব, আবদুল মতিন, মহরম আলী, মজিবল হক, মোঃ ইছাক, গোফরান মিয়া, আবদুল মান্নান, সোহরাব আলী, আবদুল গফুর, আবদুল শফিক মিয়া, আমিনুল ইসলাম, নোয়াব আলী, বাদশা মিয়া ও তার নাবালক পুত্র মোজাম্মেল হকসহ আরো অনেককে ধরে নিয়ে যায় জল- াদখানায়।

গাজী সালেহ উদ্দিনের পিতা আলী করিম অফিসে বসেই এ খবর শোনেন এবং পুত্র ও ভাইয়ের জন্য বিচলিত হয়ে ওঠেন। বাঙালিদের উদ্ধার এবং গণহত্যা বন্ধ করার জন্য তিনি প্রথমে ডবলমুরিং থানায়, পরে শান্ড়ি কমিটির সভাপতি নবী চৌধুরীর নিকট যান কিন্তু তারা কেউ এই গণহত্যা বন্ধ করতে এগিয়ে আসেননি। উপায়ান্ড়র না দেখে আলী করিম, মোঃ আলী ও নাদের জ্জামান সাহস করে কলোনিতে ঢুকে পড়েন। বাসায় পৌঁছার পূর্বেই আলী করিম ও মোঃ আলীকে ধরে নিয়ে যায়। তার সাথে আরও ৮-১০ জনকে বিভিন্ন স্থান হতে জড়ো করে। জল- াদখানায় প্রথমে তাদেরকে দিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে গর্ত খোঁড়ানো হয় এবং পরে তাদেরকেও হাজার হাজার বাঙালির সাথে হত্যা করা হয়।

ড. গাজী সালেহ উদ্দীন আহমদের বর্ণনায় উঠে এসেছে তাঁর বাবার হত্যাকা ের বর্ণনা, 'বাবাসহ সকল বাঙালি খবর পেয়েছে-বাঙালিদের ফয়েজ লেকের পাহাড়ের দিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আর কেউ ফিরে আসছে না। বাবা অস্থির হয়ে উঠলেন। অফিসের বারান্দায় ছটফট করছেন আর ভাবছিলেন কী করবেন। ছুটি পাবেন না উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিহারী। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে অফিস ত্যাগ করলেন। প্রথমে থানায় গেলেন, কিন্তু কোনো সহযোগিতা পেলেন না। সেখান থেকে শান্ড়ি কমিটির চেয়ারম্যান নবী চৌধুরীর বাড়িতে গেলেন। তিনিও সান্ড়্বনা দিলেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানালেন। কিন্তু কিছুই করলেন না। দুপুর একটার দিকে পাহাড়তলী সিডিএ মার্কেটের ওপর দিয়ে রেললাইন পর্যন্ড় এলেন। এখানে কেউ কলোনি থেকে পালিয়ে এসেছে, কেউ আশপাশের। কামরান ও কাকাকে খুঁজে পেলেন না বাবা। অস্থির হয়ে পড়লেন। এখনো বিহারীরা এবং আধা সামরিক বাহিনী তলোয়ার, দা কুড়াল ও অস্ত্র নিয়ে কলোনিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই বাবাকে কলোনিতে ঢুকতে নিষেধ করলেন। বাবা নাদের জ্জামান সাহেবসহ ঢুকে পড়লেন। তখন বেলা প্রায় দেড়টা।

...বাবার লাশ দেখতে গেলাম (বর্তমান টিভি অফিসের সম্মুখে) ওপরে সাদা হাফশার্ট দিয়ে পিছ মোড়া করে হাত বাঁধা। ছুরি চালিয়ে জবাই করেছে। গর যেভাবে কোরবানি দেয়। পেট আড়াআড়িভাবে ফাঁড়া। ভারি চশমাটা পাশে পড়ে রয়েছে। জিব বের হয়ে রয়েছে। খোলা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন যেন অনেক প্রত্যাশা একটি নিরাপদ স্বাধীন ভূখ ের।'

পাহাড়তলীর এই গণহত্যা থেকে বেচেঁ যাওয়া আবদুল গোফরান এই লোমহর্ষক, মধ্যযুগীয় গণহত্যার যে বিবরণ দেন, 'ওয়ারলেস কলোনির রাস্ড়ায় বিহারিরা জড়ো হয়ে উল- াস করছিল; বিভিন্ন স্থান থেকে যে সব বাঙালিকে ধরে আনা হচ্ছিল তারা তাদের হাত বেধে জল- াদের সামনে ঠেলে দিচ্ছে। এই জল- াদরা ঝিলের পাশে সমতল নিচু জমিতে বড় বড় তলোয়ার, ছোরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একেক ভাগে ৮-১০ জনকে হাত-পা বেঁধে প্রথমে কিল-ঘুষি তারপর জল- াদের সামনে ঠেলে দিচ্ছে। কয়েকজন সাথে সাথে শুইয়ে দিচ্ছে। জল- াদের তলোয়ার তৎক্ষণাৎ মাথা আলাদা করে ফেলে ফেড়ে দিচ্ছে। '

সাখাওয়াত হোসেন মজনুর 'রণাঙ্গণের সূর্য সৈনিক' গ্রন্থে ১০ নভেম্বরের গণহত্যার যে বিবরণ মেলে, সে অনুযায়ী সেইদিন খুব ভোবে পাঞ্জাবী লেন মসজিদ থেকে ফজরের নামাজ পড়ে কয়েকজন মুসলি- বাসায় ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে একজন অবাঙালির সঙ্গে দেখা হলে সে তাদেরকে বলেছিলো পাহাড়ের পাশে বাঙালিরা ক'জন বিহারিকে হত্যা করে ফেলে রেখেছে। তার কথার সত্যতা যাচাই কারার জন্য মুসলি- রা তাকে অনুসরণ করে দু'পাহাড়ের খোলা জায়াগায় গিয়ে দেখতে পান, সেখানে যমদূতের মতো অপেক্ষমাণ অনেক অবাঙালি। সবার হাতে ধারালো অস্ত্র। মুসলি- দের দেখামাত্র তারা 'খতম করো' বলে চিৎকার দিয়ে উঠে। অস্ত্র চালানোর আগে তাদের মধ্যে যে কথা হয়েছিল সেগুলো এরকম: কেউ বলছিলো, ইয়াছে ভাগো শালা বাঙালি লোক, কেউ বলছিলো, ভাগনে মাত দাও, আবার কেউ বলছিলো, খতম কর। ভীত সন্ত্রস্ড় মুসলি- রা কোন মতে সেই দিন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসে পাহাড়তলী পুলিশ ফাঁড়িতে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ কিছু করতে পারেনি। মুসলি- রা হচ্ছেন, এ কে এম আফছার উদ্দিন, আকবর হোসেন, আবদুল গফুর, ইয়াজদানি, মোতাহের রহমান ও মসজিদের মোয়াজ্জিন।

পরে বিহারিরা বিভিন্ন ছলছুতায় বাঙালিদেরকে সেই জল- াদখানায় নিয়ে হত্যা করতো। যারা যেতে চায়নি তাদেরকে জোর করে নিয়ে গেছে। এমনিভাবে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ধরে হাজার হাজার বাঙালিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এবং হুমকি-ধমকি দিয়ে জল- াদখানায় নিয়ে হত্যা করেছিলো অবাঙালিরা। প্রথম পর্বে আবদুল গফুর, শেখ আকবার হোসেন, আকবার শাহ মসজিদের মোয়াজ্জিন, ইফতেখার কন্ট্রাক্টর, আলী হোসেন, আলী আজমকে বধ্যভূমিতে জবাই করে হত্যা করা হয়।

একই দিন অবাঙালিরা পাঞ্জাবী লেন, মাস্টার লেন এবং ঝাউতলা স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে প্রায় ৪০০ জন যাত্রীকে জোরপূর্বক নামিয়ে পাম্প হাউসের সামনে বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যা করে।

সকাল ৭টার থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ড় এই হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত থাকে। ১০ নভেম্বর পাহাড়তলী বধ্যভূমিতে প্রায় ৫০০ লোককে হত্যা করা হয়েছে।

নির্যাতন-হত্যাকারীদের পরিচয়

পাহাড়তলী গণহত্যার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন স্থানীয় বিহারীরা। যাদের সবাই ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পূর্ব পাকিস্ড়ান থেকে এসেছে, এরা মূলত পাাকিস্ড়ান রেলওয়েতে চাকরি করত। আবার কেউ কেউ ইস্পাহানি মিলের কর্মচারী। অনেকেই এখানে নানা ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। মূলত ফিরোজশাহ কলোনি, ওয়ারলেস, শেরশাহ কলোনী, ঝাউতলা এসব এলাকায় ছিল বিহারিদের বাস। বিহারী-বাঙালি পাহাড়তলীতে দীর্ঘদিন সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করলেও '৭১ এর মার্চের শুর" থেকে এই সম্পর্কটি নষ্ট হতে শুর" করে। এরই ফলে পাকিস্ড়ানি বাহিনীর সহযোগী বিহারিদের সাথে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গণহত্যাটি এখানে সংঘটিত হয়। এই গণহত্যার নীল নকশা তৈরি করেছেন পাকিস্ড়ান রেলওয়ের সিগন্যাল ইঞ্জিনিয়ার বিহারী ইউসূফ। এছাড়া বিহারী আলী আকতার গামা, জসিম খান, নাটো, খুরশীদ, আপুয়া, ঈসা, ইউনুস, কাইয়ুম (চার্জম্যান) এই গণহত্যাসহ পাহাড়তলী বাঙালি নিধন কার্যক্রম জড়িত ছিল।

আবু তাহের জং এবং তাসাউর নামক দুই বিহারী জল- াদের নাম প্রত্যক্ষদর্শী ও ভূক্তভোগীদের জবানবন্দিতে উঠে এসেছে। যাদের মূল কাজ ছিল পাথরের উপর ফেলে মানুষ জবাই করা।

আলী আকবর নামক আর এক ভয়ংকর খুনীর কথা প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের বর্ণনায় পাওয়া যায়। তবে মনে হয় শুর"তে উলে- খিত আলী আকতার গামা এবং আলী আকবর একই লোক। পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কশপের পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন আহমদ সামদেরানী ছিলেন এ বধ্যভূমির মূল পরিকল্পনাকারী। জামায়াত নেতা আহমেদ মকবুল খান ছিল এই গণহত্যার আরেক পরিকল্পনাকারী। তিনি ছিলেন পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কশপের কর্মচারী। পাঞ্জাবী সুবেদার আকমল খার সাথেও যোগাযোগ ছিল স্থানীয় বিহারীদের। মূলত এরাই দীর্ঘ নয়মাস পাহাড়তলী বধ্যভূমিতে শতশত বাঙালিকে নির্যাতন করেছে, পৈশাচিকভাবে হত্যা করেছে। গণহত্যার সাথে সরাসরি জড়িত না থাকলেও ডবলমুরিং থানা শান্ড়ি কমিটির সভাপতি নবী চৌধুরী গণহত্যার পেছনে উস্কানি দিয়েছেন। ১০ নভেম্বর যখন বিহারীরা বাঙালিদের কচু কাটা করছিল তখন আলী করিম ছুটে যান নবী চৌধুরীর কাছে। নবী চৌধুরী তখন নির্বিকার থাকেন। উলে- খ্য শান্ড়ি কমিটির চেয়ারম্যান নবী চৌধুরী বি.এন.পি নেতা সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসর" মাহমুদ চৌধুরীর বাবা। সম্প্রতি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নবী চৌধুরীর পুত্র আমীর খসর" মাহমুদ চৌধুরীকে মুক্তিযুদ্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য পুরস্কৃত করেছে।

শহীদদের তালিকা ও পরিচয়

পাহাড়তলী বধ্যভূমিতে যারা শহীদ হয়েছেন তারা কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ নয়। পাহাড়তলীর স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি এখানে পটিয়া, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি, চন্দনাইশ, সাতকানিয়া, নাজিরহাট এমনকি চট্টগ্রামের বাইরের অনেকেই গণহত্যার শিকার হয়েছেন। এছাড়া অসংখ্য ট্রেন যাত্রী এখানে শহীদ হয়েছেন যাদের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে তাদের সুনির্দিষ্ট তালিকা তৈরি সম্ভব হয়নি।

মার্চের শেষ থেকে ডিসেম্বরের শুর“ পর্যন্ড় এখানে বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করা হয়েছে ১০ নভেম্বর, ১৯৭১। ১০ নভেম্বর ১৯৭১ এ স্থানে যারা শহীদ হয়েছেন এবং এ পর্যন্ড় যাদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তারা হলেন–

শহীদের নাম	পেশা	পিতার নাম	ঠিকানা
গোলাম ইয়জদানী	সহকারী কন্ট্রোলার অব স্টোরর্স, বাংলাদেশ রেলওয়ে		ইয়জদানি ভিলা, শহীদ লেন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম
কাজী নজর“ল ইসলাম	ছাত্র	গোলাম ইয়জদানী	ইয়জদানি ভিলা, শহীদ লেন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম
কাজী মাহবুব ইয়াজদানী	প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী	গোলাম ইয়জদানী	ইয়জদানি ভিলা, শহীদ লেন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম
গোলাম হোসেন চৌধুরী	সাব হেড ক্লার্ক, কন্ট্রোলার অব স্টোরর্স, বাংলাদেশ রেলওয়ে		পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম স্থায়ী ঠিকানা: চৌবাড়ী, পাবনা
আবদুল খালেক	কর্মচারী, কন্ট্রোলার অব স্টোরস, বাংলাদেশ রেলওয়ে		পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম
আহমদ আলি মোড়ল	কর্মচারী, ডি সি ও এস শিপিং		গোবিন্দপুর, ঢাকা
আলী করিম	সি এম ই অফিস, বাংলাদেশ রেলওয়ে		শহীদ লেন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম
মোসলেম আলী তালুকদার	বাংলাদেশ একাউন্টস অফিসের কর্মচারী		
আলী আজম মুন্সী	হেড ক্লার্ক, ডিজেল সপ, বাংলাদেশ রেলওয়ে		

আনছার আলী	কর্মচারী, বাংলাদেশ রেলওয়ে		
হায়দার আলী	শ্রমিক		
আলী	শ্রমিক		
ফজল মিয়া	শ্রমিক		
মোঃ জয়নাল আবেদীন	শ্রমিক		
মোঃ সিরাজ			
আলি নওয়াব			
সরফত আলী			
মোঃ ফসিউল আলম	প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী		
আলি নওয়াব	শ্রমিক		
নুর ল হক	শ্রমিক		
আবদুল মান্নান	শ্রমিক		
মমতাজ মিয়া	শ্রমিক		

মোঃ আকবর হোসেন	কর্মচারী, বাংলাদেশ রেলওয়ে		পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম
ওজি উল- াহ	শ্রমিক		
কফিল উদ্দিন	শ্রমিক		
আবদুল মজিদ	ব্যবসায়ী		
মোহাঃ সফিকুল ইসলাম	আই কম পরীক্ষার্থী, বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়		
মোঃ নজীর আহমদ			
কবির আহমদ			
মোঃ নুর ল হক	মুয়াজ্জিন, আকবর শাহ মসজিদ		
সৈয়দুর রহমান	কন্টাক্টর		
মোহতার র রহমান	কন্টাক্টর		
সৈয়দ আমির আলী	বীমা কর্মচারী		

আলী হোসেন	শ্রমিক		
মোঃ আবদুল গোফরান	শ্রমিক		
আবদুল মান্নান	শ্রমিক		
সৈয়দুর রহমান	শ্রমিক		
আবদুল আজিজ	শ্রমিক		
শামসুল হক	শ্রমিক		
আবদুল করিম	শ্রমিক		
আবদুল ওহাব	শ্রমিক		
আঃ মালেক	কর্মচারী, কন্ট্রোলার অব স্টোরর্স, বাংলাদেশ রেলওয়ে		
মহরম আলি	শ্রমিক		

মজিবুল হক	শিশু		
মোঃ ইছহাক	শ্রমিক		
আলি হোসেন	শ্রমিক		
গোফরান মিয়া	শ্রমিক		
আবদুল মন্নান	শ্রমিক		
সেওরাফ আলী	শ্রমিক		
আবদুল গফুর	শ্রমিক		
আবদুল সফিক মিয়া	শ্রমিক		
আমিনুল ইসলাম	কন্টাক্টর, বাংলাদেশ রেলওয়ে		
আবুল কাশেম	ব্যবসায়ী		

নোয়াব আলী	পিয়ন, এক্স.এ.এন অফিস		
বাদশা মিয়া ও তাঁর নাবালক পুত্র	কৃষক		
সুলতান আলম	কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ		
মোজাম্মেল হক	ওয়ার্ক সপ		
মো: ছায়েদুল হক	বিড়ি শ্রমিক	সামছুল হক	ভীমপুর, রামগঞ্জ, নোয়াখালী
ছালে আহম্মদ	ড্রাইবার		সরাইপাড়া
নুরুজ্জামান ও তাঁর পুত্র			মধ্য মাদার্শা

মাত্র ৬০ জনের নাম এবং পরিচয় লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্যদের পরিচয় জানা যায়নি।

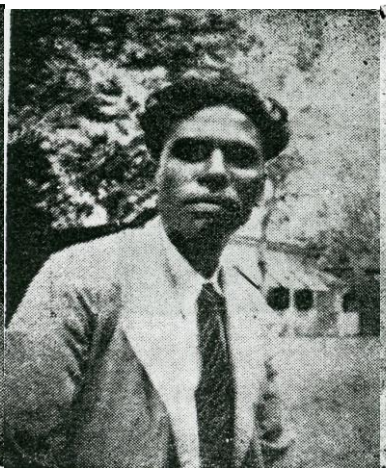
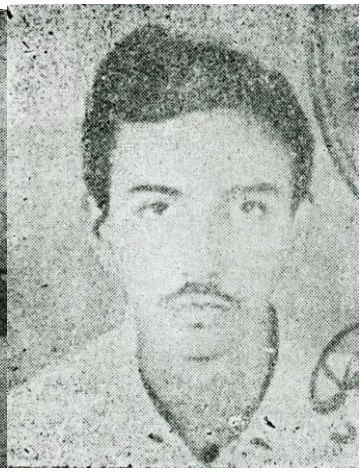

শহীদ আহমদ আলী মোড়ল শহীদ গোলাম হোসেন শহীদ মো: শফিকুল ইসলাম

১০ নভেম্বর এই তালিকা ছাড়াও দি ইঞ্জিনিয়ারিস লিঃ এর অনেক কর্মচারীকে হত্যা করা হয়েছে। যাদের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি, নাজিরহাট ও দোহাজারীগামী ট্রেনগুলো থেকে নাম না জানা অনেক যাত্রীকে নামিয়ে এই দিন ঝাউতলা স্টেশনে হত্যা করা হয়। মাত্র ২ জন ট্রেন যাত্রীর নাম ওপরে উলে- খ করা সম্ভব হয়েছে। ধারণা করা হয়, ১০ নভেম্বর অবাঙালিরা পাঞ্জাবি লেন, মাস্টার লেন, দোহাজারীগামী ট্রেনকে ঝাউতলায় থামিয়ে প্রায় ৪০০ লোককে পাম্প হাউসের সামনের বধ্যভূমিতে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। উক্ত দিন ছাড়াও পাহাড়তলী এলাকার মুক্তিযুদ্ধের শুর" থেকে বিভিন্ন তারিখে পাকিস্ড়ানি বাহিনী যাদের হত্যা করেছিল তাদের পরিচয় নিয়ে তুলে ধরা হল। এই তালিকার বাইরে বিপুল সংখ্যক লোককে এই বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়।

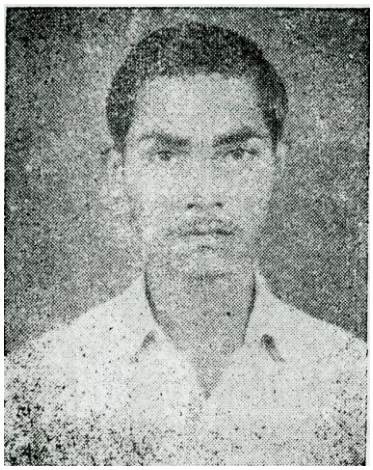

১০ নভেম্বর গণহত্যায় শহীদ মো. ছায়েদুল হক

শহীদের নাম	পেশা	ঠিকানা	শহীদ হওয়ার তারিখ	যেভাবে শহীদ হন
মোঃ ফখরুল ইসলাম	ড্রাইভার, বাংলাদেশ রেলওয়ে	মাস্টার লেইন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	২৬-০৩-৭১	সরাসরি পাকিস্তান বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে
রমনী কুমার দাস	জমাদার, বাংলাদেশ রেলওয়ে	হাসপাতাল কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	২৭-৪-৭১	অফিস থেকে ফিরে আসেন নি
এলআর খান	এসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অব ষ্টোরস, বাংলাদেশ রেলওয়ে	সেগুন বাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	**০৫-০৪-৭১**	পাকিস্তানি বাহিনী ও বিহারীরা গুলি করে হত্যা করে পরিবারসহ
জাহিদুর রহমান খান (শামীম)	ছাত্র	সেগুন বাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	০৫-০৪-৭১	ঐ
এমএ চৌধুরী	ডিইই কেটজ	সেগুন বাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	০৫-০৪-৭১	বাসায় ঢুকে বিহারিরা জবাই করে হত্যা করে
মোঃ শফি	রেলওয়ের চাকুরিজীবী	সেগুন বাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	২৭-০৩-৭১	
মো ঃ ইউসুফ	রেলওয়ের চাকুরিজীবী	টাইগার পাস, চট্টগ্রাম	২৭-০৩-৭১	বিহারীরা বাসা থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করে, লাশ পাওয়া যায় নি
আবুল কালাম	ছাত্র	টাইগার পাস, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	২৭-০৩-৭১	সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি
আবদুল আলিম (মিন্টু)	ছাত্র	২২ নং বিল্ডিং টাইগারপাস, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	২৭-০৩-৭১	বিহারীরা বাসা থেকে ডেকে নিয়ে জবাই করে, অর্ধ জবাই অবস্থায় ছুটে পালাতে চেষ্টা করে, বিহারীরা আবার ধরে জবাই করে
আবদুস সামাদ মিয়া	রেলওয়ের চাকুরিজীবী	ঝাউতলা কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	০২-০৪-৭১	সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে বিহারী ও পাকিস্তানি সেনারা বাসা থেকে

				ডেকে নিয়ে ঝাউতলা স্টেশনের নিকট গুলি করে হত্যা করে
সৈয়দ মাহবুব আলী	কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে	স্টেশন কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	১৯-০৪-৭১	অফিসে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেনি
আবদুস সামাদ মিয়া	টেলিঃ ইন্সপেক্টর, বাংলাদেশ রেলওয়ে	পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	১৫-০৪-৭১	
হাসিনুর রহমান	ফোরম্যান, বাংলাদেশ রেলওয়ে	টিপিপি কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	১৫-০৪-৭১	হাসিনুর এবং নুর"ল আমিন ফোরম্যান ক্যাশ অফিস থেকে বেতন আনতে যাওয়ার সময় বিহারীরা টাইগারপাস নেভী অফিসে জোর করে ঢুকিয়ে নির্যাতন করে ও পরে হত্যা করে সিআরবি মোড়ে ফেলে রেখে দেয়
নুর"ল আমিন	ফোরম্যান, বাংলাদেশ রেলওয়ে	সিডিএ মার্কেট সংলগ্ন	১৫-০৪-৭১	ঐ
মোঃ আবদুল গফুর	কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে	৭৯৬/ বিটিপিপি কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	১৫-১১-৭১	
এ বড়ুয়া	কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে	মামু ভাগিনা মাজার সংলগ্ন পাহাড়ের উপর বাংলো, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	০১-০৪-৭১	বাসায় ঢুকে গুলি করে হত্যা করে
আহমদ শাহ (হার")	ব্যবসায়ী	মাস্টার লেইন	০৭-০৪-৭১	সার্কিট হাউসের সামনে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন
ফখর"ল আলম	রেলওয়ে চাকুরিজীবী	ডিজেল শপ, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	০৭-০৪-৭১	
মোঃ কদম আলী	পাহাড়তলী ওয়ার্কশপ	৪২/এ উঃ আমবাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	১৭-০৫-৭১	কলম্যান সেজে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে ফয়েজ লেকে জবাই করে
মোঃ কাশেম	একাউন্টেন্ট, বাংলাদেশ	৫০/বি উত্তর আমবাগান,	৩১-০৫-৭১	বাসা থেকে নিয়ে যায়, তারপর থেকে আর খুজে

	রেলওয়ে	পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম		পাওয়া যায়নি
আমানত আলী খান	একাউন্টেন্ট, বাংলাদেশ রেলওয়ে	টাইগারপাস কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	৩১-০৫-৭১	
দেলোয়ার হোসেন খান	করণিক, বাংলাদেশ রেলওয়ে	টাইগারপাস কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	৩১-০৫-৭১	বাসা থেকে নিয়ে যায়, তারপর থেকে আর খুজে পাওয়া যায়নি
গোফরান আলী	করণিক, বাংলাদেশ রেলওয়ে	টাইগারপাস কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	৩১-০৫-৭১	ঐ
মোঃ আবদুল হাই	একাউন্টেন্ট, বাংলাদেশ রেলওয়ে	২১/বি,টাইগারপাস কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	১০-০৫-৭১	সকালে অফিস থেকে ক্যাশ অফিসে গিয়েছিলেন বেতন উত্তোলনের জন্য। সেখান থেকে ৪ জন বিহারী, মোঃ মইজুদ্দিন, মোহাম্মদ ইসহাক, মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ, এস আর আনসারি বেবি টেক্সী করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়, আর ফিরে আসেন নি
শেখ মোঃ আবদুল আজিজ	কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে	টাইগারপাস কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	০৫-০৭-৭১	১০-১২ জন বিহারি একটি মাইক্রোবাসে করে রাত সাড়ে দশটায় বাসায় মুক্তিযোদ্ধা খোঁজার অজুহাতে জোর করে ঢুকে পড়ে। মাজেদ আলী ও সৈয়দা লায়লা বেগমকে সবার সামনে জবাই করে। তারপর তারা আগেই বেঁধে রাখা শেখ মোঃ আলী রেজা ও মাখনকে মাইক্রোবাস যোগে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে হত্যা করে।
শেখ মোঃ আলী রেজা	ছাত্র	টাইগারপাস কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	০৭-০৫-৭১	ঐ

মোঃ মাজেদ আলী	ছাত্র	টাইগারপাস কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	০৭-০৫-৭১	ঐ
মাখন	চাকুরি	টাইগারপাস কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	০৭-০৫-৭১	ঐ
সৈয়দা লায়লা বেগম	ছাত্রী	টাইগারপাস কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	০৭-০৫-৭১	ঐ
আবু	চাকুরিজীবী	আমবাগান রেল গেট পানের দোকান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	১৮-০৫-৭১	বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় অজ্ঞাত স্থানে। আর খোঁজ পাওয়া যায়নি
মোঃ হাফেজ উল- াহ	পিয়ন	৬৪২/৫টি, এ ব্রাঞ্চ, আমবাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	১৮-০৫-৭১	
মোঃ সুজাউদ্দিন	সিকেপি	৫১৯/এ, আমবাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	২৩-০৫-৭১	আকবর শাহ মাজার থেকে ফজরের নামাজ পড়ে বের হতেই পাকিস্ড়ানি বাহিনী এসে একটি মাইক্রোবাসে করে ধরে নিয়ে যায়
মোঃ ইসহাক	সিকেপি	এল/৫৮/বি, আমবাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	১৮-০৫-৭১	বাসা থেকে অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে ধরে নিয়ে যায়, আর ফিরে আসে নি
ছাবেদ আলী	রেলওয়ে কর্মচারী	এল/৫৫, আমবাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	১৮-০৫-৭১	
হামিদুর রহমান	রেলওয়ে কর্মচারী	আমবাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	১৮-০৫-৭১	
বাহার	রেলওয়ে কর্মচারী	এল/৩০০/এ, আমবাগান, পাহাড়তলী,	১৮-০০৫-৭১	

		চট্টগ্রাম		
মওদুদুর রহমান	ছাত্র	আমবাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	১৮-০৫-৭১	
মোঃ মিয়া চৌধুরী	ডিএসএস পাহাড়তলী	৭৮০/এটিপিপি কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	জুন, ৭১	অফিসার কলোনি গেইট থেকে পাকিস্ড়ানি হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায়
বজল আহমদ		আবদুল হাকিমের বাড়ি, জোলার হাট, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম		
মোস্ড়াফিজুর রহমান(লেদু)	ফোরম্যান, বাংলাদেশ রেলওয়ে	জোলার হাট, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম		
আবদুল মিয়া	চাকুরিজীবী, বাংলাদেশ রেলওয়ে	জোলার হাট, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	০৪-০৪-৭১	
মোঃ এস এম কামাল উদ্দিন		সিডিএ মার্কেট, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম		বাসা থেকে ডেকে গুলি করে হত্যা করে
ছালেহ আহমেদ		সরাইপাড়া, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম		
ইদ্রিস মিয়া		লোহার পোল পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম		
হাবিবুর রহমান		লোহার পোল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম		
বাদশা মিয়া		লোহার পোল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম		
আবুল হোসেন		লোহার পোল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম		
মোঃ ইসহাক	ছাত্র	টাইগারপাস কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম		জোর করে ধরে ট্রেনের ইঞ্জিনে উঠিয়ে নেয়, পরে কুমিরা স্টেশনের কাছাকাছি স্থানে গুলি করে হত্যা করে
মোঃ আলী	পলিটেকনিক	মাস্টার লেইন,		বাসায় জিনিসপত্র ঠিক

	ছাত্র	পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম		আছে কিনা দেখতে এলে বিহারীরা ধরে নিয়ে বে- ড দিয়ে কেটে কেটে নির্যাতনের পর হত্যা করে
রওশন আলী খান	চাকরি, বাংলাদেশ রেলওয়ে	টাইগারপাস, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম		বাসা থেকে ডেকে নিয়ে ড্রেনের নিকট গুলি করে হত্যা করে
এম এ খান	চাকরি, বাংলাদেশ রেলওয়ে	টাইগারপাস, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম		
মোঃ ইউসুফ	চাকরি, বাংলাদেশ রেলওয়ে	টাইগারপাস, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	মে, ৭১	বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায় আর খোঁজ পাওয়া যায়নি
আলী আজম	বৃটিশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক, চাকরি, বাংলাদেশ রেলওয়ে	১৪/২, টি টাইগারপাস, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	০৮-০৫-৭১	
আবদুল গফুর	ইঞ্জিনিয়ার, অঃ হেড ক্লাক, বাংলাদেশ রেলওয়ে	টিপিপি কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	২০-১০-৭১	
নিরঞ্জন বিকাশ বড়ুয়া	গার্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে	এল/৫৭৮/বি, মাস্টার লেইন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	০৫-১২-৭১	
বুলু	ছাত্র, রেলওয়ে স্কুল	আমবাগান কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	০৭-০৪-৭১	বিহারী ইউনুস বাসার সামনের রেল লাইনে গলা কেটে জবাই করে। ছোট ভাই বাবু কোন প্রকারে বেঁচে যায়
আরফিনা		আমবাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম		ঈদে মিলাদুন্নবীর রাত্রিতে বিহারীরা হত্যা করে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক গাজী সালেহ উদ্দিন তাঁর ‘প্রামাণ্য দলিল: মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম’ বইয়ে বলেছেন, ‘দোহাজারী ট্রেন যাত্রীসহ ১০,০০০ (দশ হাজার) এরও অধিক বাঙালিদের হত্যা করে এ বধ্যভূমিতে লাশ সমাধিস্থ করা হয়’।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের ভাষ্য

শহীদ লেন, ওয়ারলেস কলোনি, গোয়ানিজ কোয়ার্টার, ঝাউতলা, সরাইপাড়া এলাকায় বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের ভাষ্যে উঠে এসেছে পাহাড়তলী গণহত্যার স্মৃতি। তেমন কয়েকজনের স্মৃতিচারণ নিচে তুলে ধরা হল।

এ.কে.এম আফছার উদ্দিন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

১০ নভেম্বর ১৯৭১ রোজ বুধবার, পবিত্র রমজানের ২০ তারিখ, সকাল সাড়ে পাঁচটায় আকবর শাহ্ মসজিদে জামাতে ফজরের নামাজ আদায় করে যেই মাত্র মসজিদ থেকে বের হয়ে সিড়িতে পা দিয়েছি, একজন অবাঙালি অর্থাৎ বিহারী এসে অভিযোগ করল যে, মসজিদের পূর্বদিকে পাহাড়ের কিনারে সমতল জায়গায় চারজন বিহারীকে বাঙালিরা মেরে ফেলে রেখেছে। সে উর্দু ভাষায় বলল, 'কলোনী কা হালত খারাপ হো যায়গা '। লোকটা অপরিচিত। সে আমাদের লাশ চারটা দেখার জন্য বলল। আমি, আকবর হোসেন এবং আরো দু'জন মুসল- ী ঘটনা দেখার জন্য পাহাড়ের অপর দিকে চললাম। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী রাস্ড়া পার হয়ে যখন খোলা জায়গায় গেলাম তখন অগণিত অবাঙালি নানারকম মারণাস্ত্র নিয়ে লাশগুলোর আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং অসংখ্য লোক পূর্বদিক থেকে এদিকে শোরগোল করে অগ্রসর হচ্ছে। জনতার গতিবিধি দেখে আমি এবং আমার সঙ্গীরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। দূরে আওয়াজ শুনলাম, 'খতম কর'। কয়েকজন বন্দুকধারী লোক লাশগুলোর সামনে যাদের অধিকাংশই রেলওয়ের স্টাফ এবং আমার পরিচিত।

বন্দুকধারীদের মধ্যে মোঃ আকবর খান বিশেষ উলে- খযোগ্য। আকবর খান পাহাড়তলী লোকোসেডের একজন বয়লার মেকার। ঐ সময় সে পাহাড়তলী ডি এস অফিসে মোহাম্মদ ইস্রাইল (ডিভিশনাল পারসোনাল অফিসার) ও গোলাম ইউসুফের (ডিভিশনাল সুপারিন্টেডেন্ট) দেহরক্ষী হিসেবে বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত এবং বাঙালিদের বন্দুকের ভয় দেখাত। কোন লোক অফিসের দরজায় গেলে তাড়া করত। আরও অতি পরিচিত মুখ দেখলাম। তারা হলেন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ইউসুফ, আমাদের অফিসের ড্রইং সেকশনের ইফতিখার উদ্দিন ও জিয়াউল হক। রিটায়ার্ড অফিস সুপারিনটেনডেন্ট হামিদ হোসেন। এরা সকলেই অবাঙালি। এদের হাতেও বিভিন্ন ধরণের মারনাস্ত্র। দূর থেকে মোঃ আকবর আমাদের দেখে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলল, 'ইহাছে ভাগো শালা বাঙালি লোক।' তার এই কথার সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো 'ভাগনে মত দাও, খতম কর'। এক পা, দু পা করে আমি ও আমার সঙ্গীরা পেছনে ফিরে এলাম। পাহাড়ের কিনারে জন কয়েক রেলের কন্ট্রাকটর ও অন্যান্য লোকের বাড়ি। তাদের চিৎকার করে সাবধান করলাম যে, বিহারীরা আসছে। ভীত সন্ত্রস্ড় হয়ে আকবর হোসেনসহ পাহাড়তলী পুলিশ ফাঁড়িতে এলাম। ফাঁড়িতে মাত্র তিনজন কনস্টেবলের দেখা পেলাম। তাদের কাছে ঘটনা বলে সাহায্য চাইলাম কিন্তু তারা কোন সাহায্য করতে পারল না। ডবলমুরিং থানায় ফোন করলাম। সেখান হতে সহসা সাহায্যের সাড়া পাওয়া গেল না।

আমার সঙ্গী আকবর হোসেন তাঁর পরিবার এবং ছেলেমেয়ের জন্য বিশেষ ব্যস্ড় হয়ে পুলিশ ফাঁড়ি হতে তাঁর বাসার দিকে রওনা হলো। কিছুদূর যাওয়ার পর বাসার কাছাকাছি যখন পৌঁছল, তখন কয়েকজন বিহারী তাকে ঘিরে ফেলল এবং সেই লাশগুলো যেখানে ছিল সেদিকে ধাওয়া করে নিয়ে গেল। তার এই যাওয়াই শেষ

যাওয়া। জল- াদের হাতে প্রাণ দিল আকবর হোসেন। ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীর মুখ সে আর দেখতে পেলো না। বাসায় পৌঁছার সময় তাকে দিলনা।

সকাল অনুমান সাড়ে সাতটা। আমি পুলিশ ফাঁড়িতে অস্থিরভাবে পায়চারী করছি আর কলোনীর দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছি। লোকজন দৌঁড়াদৌঁড়ি করে আসছে আর বলছে বিহারীরা দলে দলে প্রত্যেক ঘরে ঢুকছে এবং বাঙালিদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। যাকে ধরছে তাকে বলছে 'চলিয়ে, চেয়ারম্যান সাব আয়া, সবকো বোলায়া, স্টেটমেন্ট দেনা হোগা'। কাউকে বলছে 'এসপি আয়া স্টেটমেন্ট দেনা হোগা'। কাউকে বলছে 'মিলিটারি অফিসার আয়া আপলোকগো বোলায়া'। কাউকে ভাববার সময় দেয় নি। না গেলে জোর করে কয়েক জন মিলে নেওয়ার ব্যবস্থা করছে।

অধিকাংশ বাঙালি ধোঁকায় পড়ে সহজ ও সরলভাবে জল- াদখানার দিকে চলে গেছে। তাদের মধ্যে একদল ছিল লুটতরাজের কাজে। এই লুটতরাজের মধ্যে আবার ইস্পাহানী মিলের দারোয়ান এবং আধা সামরিক বাহিনী নামে কথিত সিকিউরিটি পুলিশরাও ছিল। রাজাকার এবং ইপিকাপের লোকজন বন্দুক দেখিয়ে টাকা-পয়সা জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে।

পুলিশ ফাঁড়িতে খবর পেলাম যে ১১ জনকে ধরে নিয়ে গেছে। ফাঁড়িতে কোন সাহায্য না পেয়েও অবস্থা ক্রমশ খারাপ দেখে শান্ড়ি কমিটির চেয়ারম্যান হার ুনর রশীদের বাড়িতে গেলাম। পাঞ্জাবী লাইন হতে যারা পালিয়ে এলো তারাও সকলে ট্রাঙ্ক রোডের ধারে এবং বাজারের আশে পাশে জমায়েত হয়ে রইলো। কোন উপায় নেই। কোন সাহায্য নেই। হার ুনুর রশীদ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তার গাড়িতে উঠিয়ে ডবলমুরিং থানায় নিয়ে গেলেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট জানতে পারলাম যে, ও সি সাহেব পাঞ্জাবী লাইনের দিকে গেছেন। ডবল মুরিং থানা হতে আবার পাহাড়তলী পুলিশ ফাঁড়িতে এলাম। তখন সকাল সাড়ে নয়টা। ওসির দেখা পেলাম। সংক্ষেপে তাকে বিহারীদের কার্যকলাপের বিষয় জানিয়ে সাহায্য চাইলাম। এই সময় একটা বেবী ট্যাক্সি এবং একটি প্রাইভেট কারে করে তিনজন লোক পুলিশ ফাঁড়ির সামনে নামল। তারা উর্দু ভাষী। শান্ড়ি কমিটির সদস্য বলে পরিচয় দিয়ে তারা ওসির সাথে আলাপ করল। ওসিকে আলাপের মাধ্যমে যা বলল তাতে মনে হলো যে এরা ঘটনার তেমন গুর ুত্ব দিতে রাজী নয়। আমি ওসিকে কলোনীর দিকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম, কিন্তু বিহারী তিনজনই বলল, 'সব জুট হ্যায় কলোনীমে কুস নেহি হোয়া'। নির ুপায় হয়ে আবার ডবলমুরিং থানার দিকে চললাম। একজন পশ্চিমা এসপিকে থানায় পেলাম। ঘটনা ব্যক্ত করে সাহায্য চাইলাম। এসপি সিটি ডিএসপি মিঃ বশীরকে পুলিশ ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়ার আদেশ দিলেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বললেন যে, এ মামুলি চিজ হ্যায়।

বেলা সাড়ে দশটার সময় ডিএসপি বশীর কিছু পুলিশ ও রাজাকার নিয়ে পাহাড়তলী পুলিশ ফাঁড়িতে এলো। আমিও সঙ্গে। যে চারটি লাশ আকবর শাহ মসজিদের পেছনের দিকে পাহাড়ের পূর্বদিকে বিহারীরা দেখেছিল তা আনার জন্য পুলিশ সেই দিকে চলে গেল। অনেকক্ষন পর সেই চারটি লাশ পুলিশ ফাঁড়িতে আনা হল। লাশগুলো চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। বিহারীরা কেউই সনাক্ত করলো না এই লাশগুলো সত্যিকারের কোন বিহারীর আত্মীয় স্বজনের লাশ কিনা।

পুলিশ ফাঁড়িতে অপেক্ষা করতে করতেই খবর পেলাম বহু লোককে কলোনীর বিভিন্ন বাসা এবং

রাস্ড়ার উপর হতে ধরে নিয়ে গেছে। সকাল সাড়ে ৬টা হতে দুপুর ২টা পর্যন্ড় এই ধরপাকড়, লুটতরাজ এবং জল- াদখানায় গণহত্যা চলল। পুলিশ বা মিলিটারির কোন সাহায্য এই হতভাগাদের জন্য আসে নি।

আকবর শাহ্ মসজিদের ইমাম মওলানা আমীর হোসেন সাহেবকে দু'বার মসজিদ হতে টেনে

রাস্ড়ায় এনে জল- াদখানার দিকে নেওয়া হয়েছিল। রাস্ড়ায় আর একদল লোক দেখে ছেড়ে দেওয়ায় প্রাণে বেঁচেছিলেন। খতমে তারাবির ইমাম হাফেজ সাহেব আকবর শাহর মাজারের নিচে একখানা ছোট পাকঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচান।

কোনো বাঙালি লুকিয়ে আছে কিনা দেখার জন্য অবাঙালিরা মাজারের ভেতর বার বার উঁকি দিয়েছিল। ৭০ বছরের বৃদ্ধ হতভাগ্য মুয়াজ্জিম এবং রমজানের এহতেকাফ পালনকারী আর এক ৬৫ বছরের বৃদ্ধ মসজিদের এক কোণে ভয়ে জড়সড় হয়ে কোরান তেলাওয়াত করছিলেন। উন্মত্ত জনতার ৮-১০ জন মসজিদে ঢুকে তাঁকে জোর করে ঠেলে বাইরে রাস্ড়ায় নিয়ে আসে এবং জল- াদের কাছে সমর্পণ করে।

বেলা একটার সময় আবার ডবলমুরিং থানায় গেলাম। অফিসার সাহেবকে জানালাম যে, রেলওয়ে কলোনী পাঞ্জাবী লাইন হতে অনেক জনের খবর নেই, বিহারীরা ধরে নিয়ে গেছে এবং বেঁচে নেই। এদের খবর নিতে পারেন কিনা একটু চেষ্টা কর"ন। আমার আবেদনে সাড়া মিলল না। ব্যর্থ হয়ে আবার পাহাড়তলী ফিরে এলাম। বন্ধু বান্ধব এবং তাদের আত্মীয় স্বজনের হা হুতাশ সমগ্র পাহাড়তলী ভারী হয়ে গেছে। এতোক্ষণ যে বিবরণ দিলাম তা যদি ওখানেই শেষ হতো তাহলে নিজেকে বরং ভাগ্যবান মনে করতাম। কিন্তু ফয়েজ লেকের গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল গোফরানের কাছে যা শুনলাম তাতে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে সন্ধ্যা ৬টায় ফয়েজ লেকে গিয়ে যা দেখলাম তাতে মনে হলো গোফরান মিথ্যে বলে নি। [আব্দুল গোফরানের ভাষ্য দ্রষ্টব্য]।

দেখলাম ঝিলের আশেপাশে উঁচু ভিটার উপরে এবং নিচে অসংখ্য দ্বিখন্ডিত লাশ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এক জায়গায় অনেক গুলো লাশের মাথা জড়ো করে রাখা হয়েছে। আর এক জায়গায় গর্তের মধ্যে লাশগুলোর মাথা ভিতরের দিকে এবং পা গুলো বাইরের দিকে রাখা। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে আমি এবং আমার সঙ্গীদের জ্ঞানহারা হবার উপক্রম হলো। কোন রকমে আত্মসংবরণ করে সেই জল- াদখানা ত্যাগ করে পশ্চিমদিকের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ করে চলে এলাম।

তার পরদিন অর্থাৎ ১১ নভেম্বর, একজন লোক পাহাড়ের খামারে কাজকর্ম করে বিকেল সাড়ে চারটায় সময়ে বাজারে এলে আমার সাথে দেখা হয়। তার কাছে জানতে পারলাম যে, ফয়েজ লেকের বিপরীত দিকের পাহাড়ের উপরে অনেক লাশ পড়ে আছে। আমি তখন আরো তিনজন সঙ্গী নিয়ে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে দেখার জন্য চললাম। সন্ধ্যা ৬টার সময় সেখানে পৌঁছে যা দেখলাম তা যদি প্রকাশ করি দুঃস্বপ্ন বলে মনে হবে। এই নারকীয় হত্যাকান্ডের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আছে কিনা জানি না। এটা বর্বর যুগের ইতিহাসকেও সহস্রগুণ হার মানিয়ে দিয়েছে।

কী দেখলাম? দেখলাম অগণিত মৃতদেহ। চক্ষু স্থির হয়ে গেল। সংযত হলাম। ভাল করে দেখলাম। এবার দেখলাম সব লাশ মেয়ে ছেলের। উলঙ্গ অবস্থায়। অধিকাংশই যুবতীর এবং দুই তিনদিন আগের মৃতদেহ বলে মনে হলো। ভাল করে নজর দেখলাম অধিকাংশ মৃত নারীদের পেটে সন্ড়ান। মৃত দেহগুলো এক এক স্তুপে ১০ জন ১৫ জন করে রাখা হয়েছে। এভাবে পাহাড়ের উপর বিভিন্ন স্থানে অনেক স্তুপ করে রাখা হয়েছে। আমার সঙ্গী একজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি কোন রকমে সংজ্ঞা রেখে একে একে সব মৃতদেহ গুণে দেখলাম এক হাজার বিরাশিটি হতভাগ্য যুবতীর মৃতদেহ। এই অর্ধগলিত লাশগুলো দেখে মনে হলো

অধিকাংশের পেটে ছুরি দ্বারা আড়াআড়ি ভাবে আঘাত করে বধ করা হয়েছে। পাহাড়ের পথ ধরে চুপি চুপি চলে এলাম।

পরে জানতে পারি এই যুবতী মেয়েদের চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্ড়ানি হানাদার সৈন্যদের ভোগের জন্য বিভিন্ন জায়গা হতে এনে আটক রাখা হয়েছিল। এদের অধিকাংশই শিক্ষিতা ও ভদ্রঘরের মেয়ে মনে হয়েছিল। দীর্ঘদিন আটক রাখার ফলে অন্ড়ঃসত্বা হওয়ায় ও ভোগের অযোগ্য হওয়ায় হত্যা করে অজ্ঞাত স্থানে ফেলে দিয়েছে। হানাদার পাকিস্ড়ানি সৈন্য অবাঙালি অধ্যুষিত ওয়্যারলেস ও ফিরোজ শাহ্ কলোনীর বাসিন্দার সহায়তায় এই পাহাড়ের উপর এনে ফেলেছে যাতে কেউ জানতে না পারে।

[প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীর এই ভাষ্যটি ১৯৭২ সালে *উন্মেষ* স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, স্মরণিকাটি প্রকাশ করে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক সংগঠন *সূর্যমুখী কাফেলা*র পাহাড়তলী শাখা]

গাজী সালেহ উদ্দিন (৬৪), পেশা- অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রম বিশ্ববিদ্যালয়, পিতা- শহীদ আলী করিম, ঠিকানা-শহীদ লেন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: শহীদ লেন সমাজকল্যাণ পরিষদ কার্যালয়, ১৩ নভেম্বর ২০১৪

গাজী সালেহ উদ্দিন

অক্টোবর মাস। রাত অনুমানিক ১০টা। চারদিক নিঝুম। শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। গ্রামে সাধারণত সন্ধ্যা হলেই বাতি নিভে যায়। তার ওপর রাজাকার আর পাকিস্ড়ানি সেনাদের চোরাগুপ্তা হামলা। সবাই ভয়ে থাকে। আমরা তিন ভাই বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমাদের দলের জয়নালসহ অন্যেরা বাড়ির চারদিকে এমবুশ করেছে। রাজাকার দ্বারা যেন আক্রান্ড় না হই, তাই এ সতর্কতা।

বাবা আলী করিম চট্টগ্রাম রেলওয়ে বিল্ডিঙে চাকরি করতেন, বড়ো ভাই গাজী মেছবাহউদ্দিন পশ্চিম পাকিস্ড়ানে সামরিক বাহিনীতে হিসাব রক্ষক অফিসার হিসেবে লাহোরে কর্মরত ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুর“ হওয়ার পর পালিয়ে চলে আসেন এবং বিএলএফ দ্বিতীয় ব্যাচে ভারতে ট্রেনিং নেন। স্বাভাবিকভাবে আর্থিক কারণের জন্যই বাবা চাকরিতে যোগ দিতে বাধ্য হন।

বাবাকে আমরা বুঝাতে চেষ্টা করলাম শহরে আর ফেরত না যেতে। কারণ যে কোনো সময় বাবা, কাকা ও ছোট ভাইয়ের বিপদ হতে পারে। কারণ আমাদের পাহাড়তলী পাঞ্জাবী লেনের দু'দিকেই বিহারীদের বাস। আরো জানতে পেরেছি যেসব বাঙালি চাকরিতে যোগ দিয়েছে তাদের যুবক ছেলেরা কোথাও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে কিনা তার খোঁজখবর হচ্ছে। কিন্তু বাবা আমাদের প্রস্ড়াবে রাজি হলেন না। বাবার যুক্তি ছিল চাকরি না করলে সংসার কিভাবে চলবে? এটাও আমার একটা যুদ্ধ। (পাহাড়তলী এলাকা ছাড়তে পারছিলেন না। অন্য কোথাও গেলে বাসা ভাড়াসহ আনুসাঙ্গিক খরচ বেড়ে যাবে।)

জাতির বা ব্যক্তির জীবনে স্মরণীয় দিন বা ঘটনা থাকে, পাহাড়তলী বাসির স্মরণীয় ও বেদনার দিন হলো ১০ নভেম্বর ১৯৭১ সাল। পাঞ্জাবী লেন, মাস্টার লেন, নাজিরহাট ও দোহাজারীর ট্রেন থামিয়ে ধরে এনে ফয়েজ লেক রোডে বর্তমান নবনির্মিত টিভি ভবনের সম্মুখে হাজার হাজার বাঙালিকে হত্যা করে পাকিস্ড়ানি বাহিনী। অত্যন্ড় পরিকল্পিতভাবে তারা এ গণহত্যা চালায়।

বাবা তাঁর প্রিয় লইট্টা মাছ খেয়ে রোজা রেখেছেন। খুব ভোরে অফিসের উদ্দেশে রওয়ানা হতেন। বাসা থেকে হেঁটে সিআরবি যেতে হতো। সেদিনও যথারীতি বের হয়ে আবার ফিরে এলেন। বাসায় আলী হোসেন, ছোট ভাই কামরান ও গ্রামের গোফরান সাহেব সবাই তখন ঘুমাচ্ছিল। বাবা তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে কলোনি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বললেন। কারণ তিনি জানালেন বিহারী, পাকিস্ড়ানি আধা সামরিক বাহিনীর লোকজন অস্ত্র, তলোয়ার, বন্দুক, লাঠি নিয়ে কলোনিতে ঘোরাফেরা করছে। তাদের উদ্দেশ্য ভালো নয়। বাবা আবার অফিসের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। দেরি হলেই বিহারি অফিসারের তর্জন-গর্জন শুনতে হবে। এমনকি বেতন বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। বাবার ওপর আরো ক্ষেপে আছে, কারণ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন রেলওয়ে শ্রমিক লীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পাকিস্ড়ান সরকারের সবার শেষের ঘোষণার পর চাকরিতে জয়েন করেছেন। তৃতীয়ত, আমরা কোথাও মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি কিনা, কেন শহরে ফিরে আসছি না- এসব তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করতো। ছোট ভাই বারবার তাগাদা দিতে থাকে বাসা থেকে বের হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে। কিন্তু কাকা এই বলে সান্ড়না দেন যে, আমরা কারো কোনা ক্ষতি করি নাই। আমাদের কী করবে? কিন্তু কাকার কথা সত্যি হলো না। ৭টার দিকেই বাসা আক্রান্ড় হলো। প্রথমেই তারা আমাদের তিন ভাইকে খুঁজলো। না পেয়ে কাকা, ছোট ভাই কামরান, গোফরান সাহেব ও মান্নানকে ধরে নিয়ে যায়। কলোনি থেকে আরো অনেককে ধরে নিয়ে মাঠে জড়ো করে। তাদেরকে বলা হয় যে, পাহাড়ের ওপারে (বর্তমান পাহাড়তলী চক্ষু হাসপাতালের সম্মুখে) চারটি লাশ পড়ে রয়েছে। থানা থেকে ওসি সাহেব এসেছেন লাশ শনাক্ত করার জন্য। সবাইকে ডাকছে। তাদের আচার আচরণ ইঙ্গিতে কাকা বুঝতে পারলেন তাদেরকে মেরে ফেলবে। তাই ছোট ভাই কামরানকে (তখন ৯ বছর) ডেকে বললো, আমাদের মনে হয় এরা মেরে ফেলবে। তুই ছোট আছিস, কোনো ফাঁকে পালিয়ে যা, লাফ দিয়ে ড্রেনে নেমে একদৌড়ে কামরান বাসায় চলে এলো। কিছুক্ষণ পর আবার দল বেঁধে বিহারিরা এলো এবার সে পায়খানায় লুকিয়ে রইলো। সকাল ১০টার দিকে সেখান থেকে বেরিয়ে আমাদের বাসার পিছনে হাজী বশির উল- াহর বাসার দেওয়াল বেয়ে ঢুকে পড়ে। বাসাটা দীর্ঘদিন তালাবদ্ধ থাকায় আক্রান্ড় হয়নি।

বাবাসহ সকল বাঙালি খবর পেয়েছে- বাঙালিদের ফয়েজ লেকের পাহাড়ের দিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আর কেউ ফিরে আসছে না। বাবা অস্থির হয়ে উঠলেন। অফিসের বারান্দায় ছটফট করছেন আর ভাবছিলেন কী করবেন। ছুটি পাবেন না উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিহারী। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে অফিস ত্যাগ করলেন। প্রথমে থানায় গেলেন, কিন্তু কোনো সহযোগিতা পেলেন না। সেখান থেকে শান্ড়ি কমিটির চেয়ারম্যান নবী চৌধুরীর বাড়িতে গেলেন। তিনিও সান্ড়না দিলেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানালেন। কিন্তু কিছুই করলেন না। দুপুর একটার দিকে পাহাড়তলী সিডিএ মার্কেটের ওপর দিয়ে রেললাইন পর্যন্ড় এলেন। এখানে কেউ কলোনি থেকে পালিয়ে এসেছে, কেউ আশপাশের। কামরান ও কাকাকে খুঁজে পেলেন না বাবা। অস্থির হয়ে পড়লেন। এখনো বিহারী, আধা সামরিক বাহিনী তলোয়ার, দা কুড়াল ও অস্ত্র নিয়ে কলোনিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই বাবাকে কলোনিতে ঢুকতে নিষেধ করলেন। বাবা নাদের ্জ্জামান সাহেবসহ ঢুকে পড়লেন। তখন বেলা প্রায় দেড়টা।

...বাবার লাশ দেখতে গেলাম (বর্তমান নবনির্মিত টিভি অফিসের সম্মুখে) ওপরে সাদা হাফশার্ট দিয়ে পিছ মোড়া করে হাত বাঁধা। ছুরি চালিয়ে জবাই করেছে। গর ে যেভাবে কোরবানি দেয়। পেট আড়াআড়িভাবে ফাঁড়া। ভারি চশমাটা পাশে পড়ে রয়েছে। জিব বের হয়ে রয়েছে। খোলা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন যেন অনেক প্রত্যাশা একটি নিরাপদ স্বাধীন ভূখ ের।

মোছাঃ সাইয়েদা আক্তার কাকলি (৫০), পেশা- যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী, পিতা- শহীদ আকবর, ঠিকানা-শহীদ লেন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

শহীদ আকবর হোসেনের একমাত্র মেয়ে সায়েদা আক্তার কাকলী(বামে), শহীদ জায়া রিজিয়া আক্তার(ডানে)

২৮ মার্চ ১৯৭১ সালে আমার বড়ো ভাই মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য ভারতে যান। ওখান থেকে দেড় মাসের গেরিলা ট্রেনিং শেষ করে জুনের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম শহরে এসে ২ থানার দায়িত্বে গোপনে গেরিলা ট্রেনিং দিতেন। দেওয়ানবাজার এলাকায় এক বাড়িতে হঠাৎ করে একদিন আমার বাবা আমার বড়ো ভাইকে দেখে এসে আমার মাকে বললেন, দেখো একদিন দেশ স্বাধীন হবে। ঐ দিন পাকিস্তানি হানাদাররা এদেশে থাকতে পারবে না। তারপর হতেই উনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সবসময় গোপনে সাহায্য দিয়ে আসতেন। আমার মেজো ভাই ছিলেন করাচিতে এয়ার ফোর্সে। ওখান থেকে উনি পালিয়ে নভেম্বর মাসে দেশে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আমার সেজো ভাই ঐ সময় সপ্তম শ্রেণিতে পড়ালেখা করতেন পাবনা জেলায়। উনি ওখানে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জড়িত ছিলেন। আমার বাবা ছিলেন সিআরবি সিএসটিই অফিসের কর্মচারী। তিনি ছিলেন সরল প্রাণ ও ধর্মভীরু। আমার মা এবং ভাইরা বলেন, বাবার কোনোদিন ৫ ওয়াক্ত নামাজ কাজা হতে দেখেননি। উনি খুব পরোপকারী ছিলেন। আমার বাবাকে আমার বড়ো ভাই বার বার বলতেন, 'বাবা তুমি বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও'। কারণ এসব কলোনির চারপাশেই বিহারী থাকতো। উনাকে বারংবার বলা সত্বেও উনি এই এলাকা ছেড়ে কোথাও যাবেন না। কারণ তার বিশ্বাস

ছিল তাকে বিহারিরা মারবে না। আমার মা বাবাকে অন্য কোথাও সরে যেতে বললে তিনি রেগে যেতেন। বলতেন, যার যেভাবে মৃত্যু লেখা আছে তার মৃত্যু সেখানে সেভাবেই হবে। প্রতিবেশীদের রেখে স্বার্থপরের মতো আমাদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত কি হবে? তোমার ঈমানের জোর একেবারেই নেই'।

হঠাৎ কদিন পরই আমাদের জীবনে এবং কলোনীতে বাঙালি বাসিন্দাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে ১০ মহরম কারবালা প্রান্ড়রের ঘটে যাওয়া বিষাদময় ঘটনার পুনরাবৃত্তি। দিনটি ছিল ২০ রমজান, ১০ নভেম্বর, ১৯৭১ সাল। রমজান মাসের সে দিনটিতে মসজিদে খতমে তারাবির নামাজ। একদিকে এবাদতকারীরা মসজিদে মশগুল, অন্যদিকে সে রাতেই পাকিস্ড়ানি হানাদাররা তাদের অপকর্মের দোসর বিহারীদের নিয়ে ওয়ারলেস (পাহাড়তলী) দুই পাহাড়ের মাঝের বধ্যভূমিতে গর্ত খোড়া নিয়ে ব্যস্ড়।

১০ নভেম্বর ভোর থেকেই সেখানে শুর" হয়েছিল বাঙালি হত্যার হোলিখেলা। সূর্য উঠার আগেই পুরো কলোনি ঘেরাও করে রাখা হয়। যেন কোনো বাঙালি পালাতে না পারে। আমার বাবা ফজরের নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হতেই একদল বিহারী এসে বললো, 'আকবর সাব, চলিয়ে উধার। দু পাহাড়কা অন্দর চারটা লাশ গিরা হ্যায়। উধারমে চেয়ারম্যান সাব আওর। আর্মি অফিসার আয়া হ্যায়, আপলোক উধার যা করকে সাইন দেকরকে চালা আইয়ে গা।' একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবা এবং আরো কয়জন ঐ বিহারীদের সঙ্গে ঐ দিকে চললো। ঐখানে যাওয়ার পর বিহারীরা কেউ কেউ আমার বাবাকে দেখে বললো, 'আভি খতম কর দো'। আবার কেউ কেউ বললো ' আভি নেহি বহুত টাইম হ্যায়'। উনি ওখান থেকে ফিরে এসে বাসায় মাকে বললেন, উনি বড় ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। এই কথা বলে বাসা হতে বের হতেই ঘরের সামনে থেকে বিহারীরা ওনাকে আবার ধরে নিয়ে যায়। ঐ সময় আমার ছোট ভাইয়েরা বলে- আব্বাকে আর ফেরত আসতে দেবে না। ওরা নিয়ে গলা কেটে ফেলবে। তখন আমার মা ভাইদেরকে ধমক দেন। আর বলেন, তোর বাবা ফিরে আসবেন। প্রতিটি বাঙালি পরিবারের ঘর থেকে ১২ বছরের বেশি বয়সের সব পুর"ষদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। নিমক হারাম বিহারী জল- াদরা মেতে উঠেন বাঙালি নিধনে। সে কী নিদার"ন অবস্থা। সেদিন পাহাড় ঘেরা এ এলাকায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল অত্যাচার আর মরণ চিৎকারের রব। যেনো আরেক কারবালা প্রান্ড়র। এর মাঝে ঝাউতলা রেলক্রসিং গেটে ট্রেন থামিয়ে সামর্থ্যবান বাঙালি যুবকদেরও ধরে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসে জল- াদরা। রেলওয়ের নিকটবর্তী অফিসে ঢুকে সেদিনের কর্তব্যরত বাঙালি কর্মচারীদেরও ধরে নিয়ে আসে তারা। নিয়ে গিয়ে জবাই করে সেই বধ্যভূমিতে। এমনি করে যখন দুপুর গড়িয়ে যায় তখন আমার মা খুব বিচলিত অবস্থায় ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে কলোনিতে একজন লোক সে দিনের সে পৈশাচিক বধ্য উৎসব থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন তার কাছ থেকে কলোনীর স্বজনহারা সবাই জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। তখন জানতে পারলো, ঐ দু'পাহাড়ের মাঝখানে যে চারটি লাশ শনাক্ত করার জন্য চেয়ারম্যান সাহেব কলোনির সবাইকে ডেকেছেন। কিন্তু পরে জানতে পারলেন এর"প মিথ্যে বলে কলোনি থেকে যাদের নিয়ে গেছে পরবর্তী সময়ে তারা কেউ আর ফিরে আসেননি। আসবেনও না কোনোদিন। আমার বড়ো ভাই জানতে পারেন বিকেলে। উনি সন্ধ্যায় আসেন ৬-৭ জন বন্ধুকে নিয়ে লাশ আনার জন্য ঐ বধ্যভূমিতে গিয়ে দেখেন ওখানে দুটি গর্ত খুব বড় ধরণের। একটিতে মাথা এবং অন্যটিতে শরীরের অন্য অংশ। অনেকগুলি ড্রাম ভর্তি রক্ত। একটি থেকে মাথা এবং আরেকটি থেকে লাশ উঠানো শুর" করলো। প্রায় দেড়শটি উঠানোর পর দেখলো সবগুলো এসিড দিয়ে পোড়ানো। তাই আর না পেরে উনারা পাহাড়ের উপর দিয়ে আসতে শুর" করেন। ঠিক পাহাড়ের উপরে উঠার পর দেখতে পান ৮৪টি মহিলার লাশ। দেখে ওনারা বাসায় এসে আমার মা ও ছোট ভাইদেরকে নিয়ে দেওয়ান বাজার চলে যান। তারপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই কলোনিতে ফিরে আসেন।

(শহীদ পিতার এই স্মৃতিচারণটি সংকলিত হয়েছে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত প্রজন্ম'৭১ এর বিজয় দিবস স্মরণিকা 'আত্মজ' থেকে)

আবদুল গোফরান, আকবর শাহ কলোনী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

আমি একজন সামান্য দোকানদার । পাহাড়তলীতে আকবর শাহ মসজিদের সাথেই আমার একটি দোকান ছিলো। নভেম্বরের ১০ তারিখে সেই দোকান থেকেই বিহারীরা আমাকে ধরে নিয়ে যায়। বুঝতে দেরি হয়নি তারা আমাকে কেন নিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আমার কোন গতি ছিল না। তবে হায়াত ছিলো বলে বেঁচে গেছি, কিন্তু চোখের সামনে যে ভয়াবহ গণহত্যা দেখেছি তা মনে হলে আমি আজো শিউরে উঠি।

ঘটনার দিন সকাল ছয়টার সময় প্রায় ৪০-৪৫ জন অবাঙালি আমাকে দোকান হতে জোর করে ফয়েজ লেকের রাস্ড়া দিয়ে পূর্বদিকে নিয়ে যায়। লেকের গেট যখন পার হই তখন দেখি শত শত বিহারী পাম্প হাউসের আশেপাশে ও ওয়ারলেস কলোনীর রাস্ড়ার উপর ভীড় করে উল- াস করছে। পাম্প হাউসের উত্তরদিকে উঁচু জায়গার পাশে যে ঝিল আছে সেখানে অনেক বাঙালিকে ধরে এনে হাত পা বেঁধে জড়ো করে রাখা হয়েছে। সেখানে কয়েকজন বিহারীর হাতে খোলা ছুরি ও তলোয়ার নিয়ে দাড়িয়ে । দেখলাম কয়েকজন বিহারী হাত পা বেঁধে বাঙালিদের ৫-৬ জনকে প্রথমে কিল ঘুষি লাথি মারছে ও জল- াদের সামনে ঠেলে দিচ্ছে। জল- াদ মহাউল- াসে তলোয়ার দিয়ে বাঙালিদের মাথা কেটে ফেলছে। এইভাবে কয়েকটি দল জল- াদের হাতে শহীদ হলো। আমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। আমার গায়ে তখন একটি দামি উলেন জাম্পার। এক অবাঙালির ছোকরার জাম্পারটির দিকে চোখ পড়তেই, সে এসে এটি খুলে নিল। অন্য একজন এসে আমার হাত চেপে ধরল এবং অপর একজন আমার দিকে ঘুষি বাগিয়ে আসতেই আমি কোনোরকম চিন্ড়াভাবনা না করে তাকে উল্টা ঘুসি মেরে ঝিলের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। পানিতে একডুবে ঝিলের অপর পারে গিয়ে উঠি। জল- াদের সাঙ্গপাঙ্গরা আমার দিকে সমানে ঢিল এবং পাথর ছুঁড়ছে। কিন্তু কোন ঢিল বা পাথর আমার গায়ে লাগেনি। আমাকে ধরার জন্যে প্রথমে কেউ পানিতে না নামলেও পরে কয়েকজন নামে। তাদের নামা দেখে আমি অপর পারের কাঁটাবন ও ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে মরার মত পড়ে থাকি, যাতে আমার সামান্য নড়াচড়ায় আমি কোথায় আছি বুঝতে না পারে। নরপশুরা আশপাশ দিয়ে খুঁজে না পেয়ে আবার ওই স্থানে ফিরে গেল। তারা চলে গেছে নিশ্চিত হযে আমি ঝিলের এই পার থেকেই ওই পারের বাঙালি গণহত্যা দেখতে থাকি। দেখতে পাই প্রতি দলে ৫/৬ জন বাঙালিকে এনে উঁচু ঢিবির উপর দাঁড় করায়, প্রচন্ড মারধর করে, পরে ধাক্কা মেরে জল- াদের সামনে ঠেলে দেয়। জল- াদরা পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে ও মাথা কেটে হত্যা করতে থাকে। হত্যা করার পর মৃতদেহ লাথি মেরে নিচে ও এদিক-ওদিক ফেলে দিতে থাকে। আবার কোনো কোনো খন্ডিত দেহ পূর্বদিককার পাহাড়ের দিকেও টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি।

দুপুর প্রায় ২টা পর্যন্ড় একইভাবে হত্যাকান্ড চলতে থাকে। ২টার পর দেখলাম ১০-১২ জন লোককে ধরে আনা হলো এবং বুঝতে পারলাম মৃতদেহগুলো পুঁতে ফেলার জন্যে তাদের মাটি খুঁড়তে বলা হচ্ছে। তারা হয়তো বাঁচার আশায় হাতজোড় করে কাকুতি মিনতি করছিলো। জল- াদের হাত নাড়া দেখে মনে হচ্ছিলো তারা বাঙালিদেরকে মারবে না-এইরকম একটা আশ্বাস দিচ্ছে। তখন বাঙালিরা ধীরে ধীরে মাটি খুঁড়তে থাকে এক সময় শহীদ বাঙালিদের গর্তে পুঁতে ফেলা হয়। এবার যারা মাটি খুঁড়েছিলো তাদের পালা। জল- াদরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করলো তা বাঙালিদের আবার হাতে পায়ে ধরা দেখেই বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আকুল আবেদন জল- াদের প্রাণে কোনো দয়ামায়াই জাগলো না, তাদেরও আগের বাঙালিদের মতোই মৃত্যুবরণ করতে হলো। যখন আর কোন জীবিত বাঙালি অবশিষ্ট নেই, তখন জল- াদরা আনন্দে হৈ হৈ করতে করতে ফিরে গেল। তখনো অনেক মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলো যে শিয়াল-কুকুর-শকুনের খাদ্য হয়ে রইলো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(পাহাড়তলী গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের এই ভাষ্যটি সংকলিত হয়েছে রশীদ হায়দার সম্পাদিত *১৯৭১: ভয়ংকর অভিজ্ঞতা* থেকে)

মোহাম্মদ শামসুল হক, সহকারী হিসাব রক্ষক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস পরিষদ, ১৯৭৩

....১০ নভেম্বর। সে দিনটি ছিল ২০ রমজান। খুব সকালবেলা পাহাড়তলীর পাঞ্জাবী লাইন, ওয়ারলেস কলোনী এবং বাহাদুর শাহ কলোনীর শিশু, যুবক, যুবতি, নারী-পুর"ষ, বৃদ্ধকে বাসা থেকে জোর পূর্বক ধরে আনে এবং কাউকে মিলিটারী অফিসার সাহেব ডাকছে বলে ধোঁকা দিয়ে ওয়ারলেস কলোনীর নিকটস্থ পাহাড়ে দল বেঁধে নিয়ে যায় সেখানে জল- াদেরা ধারাল অস্ত্র এবং স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালায়। সকাল থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ড় এই হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত থাকে। আমরা কয়েকজন আফছার উদ্দিন, আব্দুস সোবাহান ও মোহাম্মদ ছাবেদ মিয়া এই হত্যাযজ্ঞ পাহাড়ের জঙ্গল থেকে দেখতে পাই। সেদিন নরঘাতকরা এক এক বারে আনুমানিক দু'শ' লোককে হত্যা করে তাদের শরীরের কাপড়গুলো একত্রিত করে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ১০ নভেম্বর ৩টার সময় একজন সামরিক অফিসারসহ অনেকে ওয়ারলেস কলোনী দেখতে আসে সাথে আমরা প্রায় ৩শ' লোক তাদের সাথে উক্ত জায়গায় গিয়ে পৌঁছাই। হাজার হাজার নারীপুর"ষের লাশ পড়ে আছে। কোথাও কোথাও মৃতদেহগুলো একত্রিত করে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়েছে। নরপশুরা আত্মীয়স্বজনকে লাশ দিতে অস্বীকার করে। পাহাড়ের ওপরে বিবস্ত্র অবস্থায় অনেকে যুবতী নারীর দেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে। শামসুল হক জানিয়েছিলেন কিছু সংখ্যক পাকিস্ড়ানি সেনা এবং বিহারীরাই এই হত্যাযজ্ঞ চালায়।

গাজী কামাল উদ্দিন (৫৫), পেশা- চাকুরি, পিতা- শহীদ আলী করিম, ঠিকানা-শহীদ লেন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: শহীদ লেন সমাজ কল্যাণ পরিষদ কার্যালয়, ১৩ নভেম্বর ২০১৪

তিন ভাইকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়ে বাবা এসেছেন চাকুরীতে জয়েন করতে জুন মাসে, এবারই শেষ সুযোগ। সময় সীমা আর বাড়াবে না পাকিস্ড়ান সরকার, আমাকে বাবা সাথে আনলেন, ক্লাস ফোর এ পড়ি তাই নিশ্চিত ছিল বাবা আমাকে কেউ কিছু বলবে না, যে তিন ভাই এর জন্য দুশ্চিন্ড়া তারা মুক্তিযোদ্ধা, কবে দেশ স্বাধীন হবে কবে বাবা তাদের মুখ দেখবে সম্ভবত তাই আমাকে সাথে সাথে রাখতে চেয়েছেন।

ট্রেনে এসে পাহাড়তলী নামলাম, পাহাড়তলীর সেই প্রাণচাঞ্চল্য আর নেই কেমন যেন নির্জীব, নিশ্চুপ, কেউ কারো সাথে ভালভাবে কথা বলে না, কেমন যেন বিষাদ বিষাদ ভাব। আমাদের বাসায় চাচা আলী হোসেন স্বীয় গ্রামের আব্দুল গোফরান তিনিও আশ্রয় নিয়েছেন, সৈয়দপুর চাকুরি করতেন, ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ শুর" হয়ে গেলে কর্মস্থলে যেতে পারেননি তাই সিআরবিতে যোগদান করতে চান দরখাস্ড় দিয়েছেন কিন্তু এখনও অনুমতি পাননি আব্দুল মালেক ও তার ভাই বাসায় থাকতো (নাম মনে নেই) পাশে বিড়ি ফ্যাক্টরীতে কাজ করতো।

২০ রমজান, ১০ নভেম্বর '৭১। সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে আমার বাবা শহীদ আলী করিম অফিসে রওয়ানা দেন। তিনি অফিস যেতেন পাঞ্জাবী লেন হতে পাহাড়তলী সিডিএ মার্কেট দিয়ে ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড হয়ে ঘুরা পথে সিআরবি তে। আমবাগান টাইগারপাস দিয়ে বাঙালিরা যাতায়াত করতে পারত না। কিছুক্ষণ পর আব্বা অফিসে না গিয়ে বাসায় চলে আসেন। তিনি জানান, 'বিহারীরা দলবদ্ধভাবে পাঞ্জাবী লেইনের দিকে এগিয়ে আসছে। তোরা সবাই সিডিএ মার্কেটের দিকে চলে আয়'। আমি, আব্বা, চাচা আরো খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য ঘর হতে বেরোতেই দেখা জনৈক নুর ুন্নবীর সাথে। তিনি আমাদের ঘরে চলে যেতে বলন। তার কথা শুনে ঘরে চলে যাই। ঘরে ঢুকতে সেখানে আরো আসেন মান্নান ও গোফরান। এরাও এসেছিলেন খবরাখবর জানতে। আমরা সবাই বসে আলাপ করে সিদ্ধান্ড় নিই চলে যাওয়ার। সবাই ঘর হতে বের হয়ে গেলে আমি ঘরে তালা লাগাতে থাকি। এ সময় একজন বুড়ো বিহারী এসে বলে, 'ঠেরো ঠেরো'। আবার আমরা ঘরে ঢুকে যাই। আমি ভয়ে পায়খানায় ঢুকে যাই। পরে আমার বাসায় রাখা একটি ড্রামে লুকিয়ে থাকি। এ সময় শুনতে পাই একদল বিহারী এসে, গোফরান সাহেব ও মান্নান সাহেবকে বলছে, 'হাসপাতালের সামনে ৪ জন লোকের লাশ পড়ে রয়েছে আপনারা ওদের চিনেন কিনা দেখে আসবেন'। কথাবার্তার পর এ তিনজন বিহারীদের সাথে চলে যান। চাচা কোথায় গেলেন বুঝতে পারিনি। কিছুক্ষণ পর একদল বিহারী এসে আমাকে ড্রাম হতে টেনে বের করে নিয়ে গার্লস স্কুলেন সামনে দাঁড় করায়। সেখানে চাচাকে দেখে আমি তার সাথে দাঁড়াই। চাচা আমাকে দেখে কানে কানে বললেন, 'অবস্থা সুবিধার হচ্ছে না'। তার কথা শুনে আমি লাইন হতে এক দৌড় দিই। বিহারীরাও পিছনে আমাকে দৌড়াতে থাকে। দৌড়াতে দৌড়াতে ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমি সোনা মিয়া ড্রাইভারের বাসায় ঢুকে পায়খানার টিনে বসে থাকি। বিহারীরা আমাকে আর পায় নি। বেশ কিছুক্ষণ পর গায়ে পায়খানা মাখা অবস্থায় হক সাহেবের বাসায় ঢুকে গোসল করি। হক সাহেবকে বিহারীরা সমীহ করত। তিনি আমাকে তার স্টোরর ুমে ঢুকিয়ে তালা মেরে রেখে দেন। আড়াই টার সময় তিনি তালা খুলে বলেন, বিহারীরা চলে গেছে। আমি বের হয়ে আব্বার খোঁজ করতে থাকি। এ সময় মিলিশিয়া ও পুলিশ পাঞ্জাবী লেইনে ঢোকে। ডবলমুরিং এর ওসি আসেন। তিনি সবাইকে চলে যেতে বলেন। সিডিএ মার্কেটে অনেকের সাথে দেখা হয়। তাদের থেকে জানতে পারলাম বাবা দিনের একটার দিকে আমাকে ও চাচাকে খুঁজতে কলোনীতে প্রবেশ করেছে। এবং ধরে নিয়ে যাওয়া বাঙালিদের লাশ দেখে এসেছে ফয়েজ লেকের কাছে বধ্যভূমিতে আমি বর্ণনা শুনতে পেলাম প্রত্যক্ষদর্শীদের টুটু ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম বাবার নৃশংস হত্যাকা ের কথা বাবাকে হত্যা করেছে সবার শেষে তাই বাবার লাশ পড়েছিল বধ্যভূমির সব লাশগুলোর উপরে, বাবার সাদা জামা দিয়ে পিছনে হাত বাঁধা, জবাই করেছে এবং পেট ফেঁড়ে ফেলেছে। বাবার চশমাটা পড়ে আছে লাশের ঠিক পাশেই।

উম্মে আতিয়া রহমান (পুতুল) (৬৫), পেশা- গৃহিণী, ঠিকানা- মোতাহের কন্ট্রাক্টর বাড়ি, শহীদ লেন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১৩ নভেম্বর ২০১৪। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন: আহম্মেদ শরীফ, প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১০ নভেম্বর '৭১ সাল। ভোরে ঘুম ঘুম অবস্থায় শুয়ে থাকতেই স্বামীর কোরান পড়ার শব্দ পাই। ৯ মাসের ছোট ছেলেকে নিয়ে আমি শুয়েছিলাম। হঠাৎ শুনি পাশের বাসার সৈয়দুর রহমানকে বিহারীরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এসময় আমার এক ভাতিজা এসে বলল বিহারীরা মোতাহের সাহেবকে ডাকছেন। শুনে মোতাহের সাহেব ভাতিজাসহ সৈয়দ সাহেবকে নিয়ে বিহারীদের সাথে চলে গেলেন। এরপর আমার ভাশুর মোজাম্মেলুর রহমান, জ্যেষ্ঠ দেবর আমিনুল ইসলাম, দুই দারোয়ান সওয়ার আলী, কবির কেও ধরে নিয়ে যায়। মোজাম্মেল সাহেব ৯ নভেম্বর আমার বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন। এদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে বিহারীরা হত্যা করে। পুতুল জানান সেদিন সকাল হতে হাজার হাজার বিহারীরা এসেছিল বাঙালিদের ধরতে। তবে যে সব বাঙালি বিহারীদের সাথে স্বেচ্ছায় যায়নি, তর্ক করেছে তাদের ওরা নিতে পারেনি। এভাবে পুতুলের ভাই ইফতেখার রসুল বেঁচে যান। তাকে নিতে চাইলে রসুল বিহারীদের সাথে তর্ক শুর" করে দেয় ও যাবে না বলে জানায়। এক পর্যায়ে বিহারীরা তাকে না নিয়েই চলে যায়। ধ্বংসযজ্ঞের মাঝেই জনৈক বিহারী পিছন দরজা দিয়ে এসে পুতুল ও বাসার সবাইকে চলে যেতে উপদেশ দেয়।

মো: রাইসুল হোসেন সুজা (৬০),পিতা: শহীদ আকবর হোসেন, পেশা: চাকুরী, ঠিকানা: শহীদলেন, রেলওয়ে কলোনী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। সাক্ষাতকারের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: শহীদ লেন সমাজ কল্যাণ পরিষদ কার্যালয়, পাহাড়তলী চট্টগ্রাম, ১৩ নভেম্বর ২০১৪

১৯৭১ সালে রাইসুল হোসেন সুজা ছিলেন ১৬ বছরের তর"ণ।ওই সময় তার বাবা আকবর হোসেন ছিলেন রেলওয়ের কর্মচারী।এই জল- াদখানায় বিহারিদের হাতে তাঁর বাবাও শহীদ হন। সুজার বড় ভাই মো.রকিবুল

হাসান মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বলে বিহারিরা তাঁর বাবাকে হত্যা করেছে বলে তিনি দাবী করেন। সুজা বলেন, '৭১ সালের ১০ নভেম্বর সকাল ৭টার সময় আমার বাবাকে পাঞ্জাবী লেনের বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় বিহারিরা। সঙ্গে ছিল স্থানীয় কিছু আলবদর। বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে শুনে সন্ধ্যার একটু আগে সেখানে গিয়ে দেখি চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। সেদিন কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল বিহারিরা। কারও কারও মুখ এসিডে ঝলসানো। সবার গলা কাটা আর পেট ফাঁড়া। তিনি বলেছিলেন, এখন যেখানে ইউএসটিসির অর্ধনির্মিত ভবন সেখানেই সব লাশ একটি গর্তের ভিতর ফেলা হয়েছিল। কোন কোন লাশের মাথা বিচ্ছিন্ন করে পাশের একটি গর্তে ফেলা হয়। শেষ পর্যন্ড় গর্তে হাজারও লাশের মাঝে সুজা তার বাবার লাশ খুঁজে পান নি। ওইখানে রক্ত ভর্তি দুটি বড় ড্রাম রাখা ছিল। জবাই করার স্থানে একটি বড় আকারের পাথরও ছিল যেটাতে ছুরি ধার দেয়া হতো।

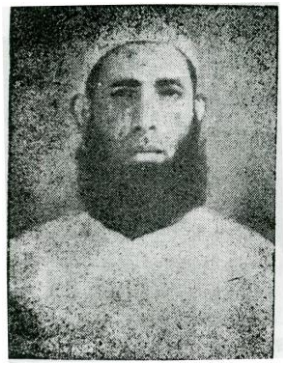

শহীদ আকবর হোসেন

তবে মানুষ খুন করে কেন তারা রক্ত জমা করেছিল তা তার বোধগম্য নয় বলে জানান। শহীদলেন সমাজকল্যাণ পরিষদেও কার্যালয়ে যখন সুজার সাথে কথা হচ্ছিল, তখন তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলছিলেন পাহাড়তলীতে শহীদ হাজার হাজার বাঙালির স্মৃতি সংরক্ষণে সরকারের ব্যর্থতার কথা। পাহাড়তলী গণহত্যা নিয়ে কত কথা হল।এই বধ্যভূমির মাটি সংরক্ষণ করা হল মুজিবনগর জাদুঘরে, হাড় ও মাথার খুলি সংরক্ষণ করা হল চট্টগ্রাম সেনানিবাসের সামরিক জাদুঘরে, কিন্তু বধ্যভূমিটি সংরক্ষণে নেই কোন প্রশাসনিক কর্মতৎপরতা। এর এক অংশে সরকারী ইজারায় বিনোদন কেন্দ্র, অন্য অংশে ইউ.এস.টি.সির নির্মাণাধীন ব্যাবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট। এই নানামুখী ব্যবসায়িক তৎপরতায় প্রায় দশ হাজার শহীদের স্মৃতি আজ বিলুপ্ত প্রায়। বাবা হারানোর পাশাপাশি বাবার স্মৃতিময় বধ্যভূমিটির সংরক্ষণ করতে না পারার কষ্ট তাঁর চোখে-মুখে।

কাজী আমিনুল ইসলাম, পিতা- শহীদ কাজী গোলাম ইয়াজদানী , পেশা- ব্যবসা, ঠিকানা- ইয়াজদানী ভিলা,শহীদ স্মরণী আবাসিক এলাকা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

শহীদ কাজী গোলাম ইয়াজদানী এবং তাঁর দুই পুত্র শহীদ কাজী নজর ল ইসলাম ও কাজী মাহবুব ইয়াজদানী

কাজী আমিনুল হারিয়েছেন বাবা ও দুই ভাইকে। বাবা আর চার ভাইয়ের সঙ্গে আমিনুলকেও বিহারিরা ধরে এনেছিল জল- াদখানায়। আমিনুল ও বড় ভাই কাজী আনেয়ার ল ইসলাম পালাতে পারলেও বিহারিদের হাতে প্রাণ দেন বাবা ও অন্য দুই ভাই। তিনি বলেছিলেন, সকাল ১০ টার দিকে ঝাউতলা এলাকায় দোহাজারী ও নাজিরহাট র টে চলাচলকারী দুটি ট্রেন থামিয়ে কয়েক হাজার বাঙালিকে জল- াদখানায় ধরে আনে বিহারীরা। ওদের মধ্যে তারাও ছিলেন। অনেক লোকের জটলা থেকে বড় ভাইকে নিয়ে তিনি পশ্চিমে ছড়ায় নেমে পিছনের জঙ্গল এলাকা পার হয়ে পালিয়ে যান। এরপর তিনি বাবা এবং দুই ভাইকে বাচাঁনোর জন্য ছুটে যান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে। সেখানে প্রশাসনের লোকদের জানান। পরে যান স্থানীয় শান্ড়ি কমিটির চেয়ারম্যান নবী চৌধুরীর কাছে। নবী চৌধুরী তাকে লোক দিয়ে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট(এমপি) বশির আহম্মেদেও কাছে পাঠান। এ দু'জনের পরামর্শে আমিনুল ওইদিন দুপুরে ডবলমুরিং থানায় একটি মামলাও দায়ের করেন। পরে পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা আমিনুলকে নিয়ে যায় জল- দখানায়। তিনি বলেন, দুটি ড্রাম রক্তে ভরা ছিল। মানুষের রক্তের স্রোত গিয়ে ছড়ার পানিতে মিশেছিল।

স্বাধীনতার পর আমিনুল একইভাবে ছুটে গিয়েছিল নানা নেতার কাছে, প্রশাসনের কাছে পিতা ও দুইভাই হত্যার বিচারের দাবিতে, কিন্তু ১০ নভেম্বর যেমন পাকিস্ড়ানি বাহিনীর হাত থেকে তিনি তাদেরকে বাচাঁতে পারেননি। ঠিক তেমনি স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরও তিনি পারেননি পিতা ও ভাই হত্যার বিচার করতে, পারেননি তাদের স্মৃতিময় বধ্যভূমি সংরক্ষণ করতে। তিনি ১০ নভেম্বর সরকারিভাবে পাহাড়তলী গণহত্যা দিবস পালনের দাবী জানান, উচ্চ আদালতের রায় মেনে বধ্যভূমির উপর ইউ. এস. টি.সির ভবন অপসারনের দাবী জানান।

স্মৃতি সংরক্ষণের প্রয়াস

পাহাড়তলী বধ্যভূমি, স্থানীয়ভাবে যেটা জল- াদখানা বধ্যভূমি নামে পরিচিত, মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাসের সাক্ষী। প্রত্যাক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের বর্ণনা, একাত্তর পরবর্তী সময়ে লিখিত পত্র পত্রিকার প্রতিবেদন, স্মরণিকার উপর ভিত্তি করে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই বধ্যভূমিতে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে কমপক্ষে দশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। মুক্তিসংগ্রামের এমন স্মৃতি বিজড়িত বধ্যভূমি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হয়েছে অবহেলিত, বঞ্চিত।

১৯৭২ সালের ২১ আগস্ট চট্টগ্রাম সরকরী কলেজের সাংস্কৃতিক সংগঠন *সূর্যমুখী কাফেলার* পাহাড়তলী শাখার উদ্যোগে পাহাড়তলী গণহত্যায় শহীদদের স্মরণে একটি স্মরণিকা বের করা হয়। *উন্মেষ* নামের এই স্মরণিকার হেডিং ছিল 'শহীদদের তপ্ত শোণিত হোক আমাদের নতুন যাত্রাপথের আলোক বর্তিকা।' এই স্মরণিকায় শহীদদের অনেকের ছবি, পরিচয়, ভুক্তভোগীদের সাক্ষাৎকার এবং স্বজনহারা লোকদের আর্তি ছাপানো হয়েছিল।

পাহাড়তলী বধ্যভূমি মুক্তিযুদ্ধের পর প্রায় বিস্মৃত হতে শুর" করে। স্বাধীনতার পর এখানে একটি গর্তেই পাওয়া গিয়েছিল ১১০০ মাথার খুঁলি। যা বর্তমানে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের স্মৃতি অম্লান জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। অথচ ছিল না এই বধ্যভূমি সংরক্ষণের কোন উদ্যেগ।

১৯৯৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর এই বধ্যভূমি সংরক্ষণে এগিয়ে আসেন প্রজন্ম '৭১ এর চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটি। তারা বধ্যভূমির ওপর ছোট টিনের একটি নামফলক স্থাপন করেন। প্রজন্ম '৭১ এর সভাপতি ড. গাজী সালেহ উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক সলিল চৌধুরীর এই উদ্যোগটি ছিল এই বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রথম প্রয়াস।

মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্বজন, বুদ্ধিজীবীসহ সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি, প্রায় দুই একর আয়তনের এ বধ্যভূমি সংরক্ষণ করা হোক। ওয়ার সিমেট্রির আদলে এখানে নির্মাণ করা হোক একটি স্মৃতিসৌধ।

এই প্রেক্ষিতে ১৯৯৮ সালের ২০ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পাহাড়তলী বধ্যভূমি সংরক্ষণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের নির্দেশ দেন এবং ১৯৯৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি একইভাবে প্রধানমন্ত্রী দপ্তর থেকে জমি অধিগ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেয়া হয়। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর বধ্যভূমিসহ দেশের অন্যান্য এলাকার নয়টি বধ্যভূমি সংরক্ষণে সাত কোটি ছয় লাখ টাকা বাজেটের একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এর আওতায় তৎকালীন সরকার পাহাড়তলী বধ্যভূমির জন্য ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় দুই একর জমিতে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি কমপে- ক্স নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এদিকে একই সালের ৪ মে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক পাহাড়তলী বধ্যভূমির জন্য এক দশমিক ৭৫৪ একর জায়গা অধিগ্রহণে কোনো বাধা নেই মর্মে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর একান্ড়

সচিবের পক্ষ থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে একটি চিঠি পাঠানো হয়। যার স্মারক নং- ১৩.৩৯.১৬.০০.০০.০৫.৯৮-১৫১০ তাং ২০/১২/১৯৯৮। এ ব্যাপারে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ডিসি বরাবর ৯৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের ফলে পালটে যায় সবকিছু। এমনকি প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ মন্ত্রণালয়ের ৯৪ লাখ টাকা ফেরত নেয়ার জন্য বারবার তাগাদা দেয়া হয়। আর বধ্যভূমির প্রায় পুরো জায়গা কিনে সেখানে একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভবন তৈরির কাজ শুর" করে। এ ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধাসহ চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানায়। তাদের দাবি ছিল গোটা বধ্যভূমি সংরক্ষণ করা হোক। বধ্যভূমিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ প্রহসন বলে উলে- খ করেন তারা। ওই সময় এর প্রতিবাদে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে খোলা চিঠি দেয়া হয় এবং শহীদের স্বজনদের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে পাহাড়তলী বধ্যভূমি সংরক্ষণের দাবি জানানো হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী ১০ই নভেম্বর রোজ বুধবার ২০শে রমজান বিহারীরা বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাঞ্জাবীলেন, মাস্টারলেন ঘেরাও দিয়ে বাঙ্গালীদের ধরে এনে ঐ বধ্যভূমিতে জবাই করে, কারো কারো মাথা ধড় থেকে আলাদা করে পাশে দুটি ড্রামে ভর্তি করে রাখে, ড্রাম ভর্তি রক্ত ও মাথা অনেকে দেখেছেন। এখানে দু'টি বড় পাথর ছিল। যাতে ছুরী, তলোয়ার শান দিয়েছিল। ধার দিতে দিতে পাথর দুটি একাদশী চাঁদের মত হয়ে গিয়েছিল, ভোর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞ চলছিল। এক পর্যায়ে বধ্যভূমির উপরে লাশের সংকুলান না হওয়াতে ধরে আনা বাঙ্গালীদের দিয়ে বধ্যভূমির উত্তর পাশ দিয়ে মাটি খুঁড়ে গর্ত করে অনেক লাশ ঢুকিয়েছিল। খুঁড়লে সম্ভবতঃ এখনও কংকাল পাওয়া যাবে। ঐ পৌনে দু একর জমির তিন দিকে ছিল জলাশয়, উক্ত জলাশয়ের পানিতে ডুব সাতার দিয়ে আবদুল গোফরান নামক ব্যবসায়ী বেঁচেছিল বিহারী জল্লাদদের হাত থেকে, তার বিবরণ দৈনিক আজাদীতে স্বাধীনতার পরই প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা গত ৩০. ১১. ৯৮ তারিখে রায়ের বাজার বধ্যভূমি ও পাহাড়তলী বধ্যভূমিটি অধিগ্রহণ ও সংরক্ষনের নির্দেশ দেন। (পত্র সংখ্যা ৬১. ৩৯. ১৬. ০. ০. ৬. ৯৮-২৭(৬৬) তারিখ ৭. ০২. ৯৯ সন) আপনি নিশ্চয়ই জানেন ইতিমধ্যে রায়েব বাজার বধ্যভূমিটি ৬.৫১ একরের উপর ১৭৬১.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংরক্ষিত হয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর এই বধ্যভূমিটির সাথে অন্যান্য জেলায় আরও আটটি বধ্যভূমি সংরক্ষনের উদ্যোগ নিয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও গণপুর্ত বিভাগ যৌথভাবে এই বধ্যভূমি অধিগ্রহণ ও সংরক্ষন ও বাস্তবায়ন করবে যা পরবর্তীতে জাতীয় জাদুঘর দেখভাল করবে, এ কাজগুলিকে সময়য় করার জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন বধ্যভূমি অধিগ্রহন ও সংরক্ষন নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যার সভাপতি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমান এই কমিটির কাজ শেষ পর্যায়ে। এই কমিটি বিভিন্ন সভায় যে আলোচনা হয়েছে তা হলো ঃ পাকিস্তানীদের বর্বর হামলার কাহিনী, হত্যাকান্ড, নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষনের উপর ভিত্তি করে লাইট এন্ড সাউন্ডের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানানো, শহীদের ব্যবহৃত জিনিষপত্র সংরক্ষণ এবং স্থানীয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ করা, আর তাই এ দায়িত্ব পড়েছে জাতীয় যাদুঘরের উপর। তাই আপনার বা প্রাক্তন জমির মালিকের প্রস্তাবিত ৫ কাঠা জমিতে এ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা কতটুকু বাস্তবতা রয়েছে তা আপনিই বিচার করুন। আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রয়কৃত এই বধ্যভূমিতে বঙ্গবন্ধু হাসপাতালের অবকাঠামো নিশ্চয়ই গড়ে তুলবেন, আপনি **মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, মুক্তিযুদ্ধে শহীদের রক্তে ভেজা এই মাটিতে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি অবকাঠামো গড়ে উঠে তাহলে ইতিহাস কি বলবে? আপনি বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন, বাংলাদেশ তথা দক্ষিণপুর্ব এশিয়ায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনি একজন ব্যক্তিত্ব। তাই আপনার প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আপনার স্থান কোথায় হবে?**

তাই আপনার কাছে আমাদের সন্নিবর্ন্ধ অনুরোধ "জল্লাদখানাটি" অবিকৃত রাখার ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন এবং সরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানাবেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন। মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামবাসীর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তাই এখানে অন্যান্য স্থান হতে, নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা বেশী হয়েছিল কিন্তু এখানে কোন স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষন করা হয়নি। পক্ষান্তরে ১৯৪৪ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সমাধীস্থল সংরক্ষিত হচ্ছে সুদুর লন্ডনে বসে, (চট্টগ্রাম, কুমিল্লায়)। আর আমরা কি করছি?

শহীদলেন, মাস্টারলেন, গোয়ানিজ কোয়াটার, সরাইপাড়া এলাকার
মুক্তিযুদ্ধের শহীদ পরিবারের
পক্ষে-
প্রফেসর গাজী সালেহ উদ্দিন
সভাপতি প্রজন্ম' ৭১ চট্টগ্রাম বিভাগ
ও
সদস্য, ব্যক্তিমালিকানাধীন বধ্যভূমি বাস্তবায়ন সংরক্ষণ কমিটি
সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলামের কাছে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পরিবারের সদস্যদের খোলা চিঠি।

"বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তম বধ্যভূমি" ১০ই নভেম্বর ৭১ রোজ বুধবার (২০শে রমজান) পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী শত শত বাঙ্গালীকে জবাই করে হত্যা করে। তার আংশিক দৃশ্য। স্থান ঃ চট্টগ্রাম পাহাড়তলী টেলিভিশন কেন্দ্রের বিপরীতে, ছবি-সেলোমান।

প্রিয় মহোদয়,
পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি (বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তম বধ্যভূমি চট্টগ্রাম পাহাড়তলী সিটিডি এর সম্মুখে) আপনি বধ্যভূমিটি ক্রয়মূলে মালিক হয়ে সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে দখল নিয়েছেন। আপনি আরও দাবী করেছেন স্মৃতিসৌধ নির্মানের জন্য পূর্বের মালিক কর্তৃক দানকৃত ৫ কাঠা জমি সংরক্ষিত রয়েছে।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আপনি যে জায়গাটি ক্রয় করেছেন (পাঁচলাইশ থানার পাহাড়তলী মৌজার বি. এস, দাগ নং ১৫২, ১৫২) তা সম্পূর্ণটাই বধ্যভূমি। ঐ স্থানে আমাদের প্রিয়জন বাবা, কাকা, ভাই, ও নিকট আত্মীয়দেরকে জবাই করে হত্যা করেছিল ১০ই নভেম্বর ৭১ সনে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা। শুধুমাত্র শহীদলেন, মাস্টারলেন, গোয়ানিজ কোয়াটার ও সরাই পাড়া থেকে শত শত বাঙ্গালীকে একই দিনে হত্যা করা হয়েছিল বধ্যভূমিতে যাকে স্থানীয়ভাবে **"জল্লাদখানা"** বলা হয়ে থাকে। শহীদ পরিবারের অনেকে এখনও বসবাস করছে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে শহীদলেন ও মাস্টারলেনে প্রয়োজনে সত্যতা যাচাই করতে পারেন। প্রাক্তন মালিক রাহেলা গং তার যে ৫ কাঠা জমি দান করে বদান্যতা দেখিয়েছেন, তা শুধুমাত্র ব্যবসায়িক কৌশল মাত্র। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার ব্যক্তিমালিকাধীন বধ্যভূমি সংরক্ষনের প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ঐ বধ্যভূমিটি চিহ্নিত করে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের জানিয়ে দিয়েছেন যে বধ্যভূমি সংরক্ষনে জমি অধিগ্রহনে কোন আইনগত বাধা নেই। (স্মারক নং ১২-২-২০০/১৩৬/ সাধারণ তাং ৪/৫/২০০০ বর্তমানে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ১০ই নভেম্বর এ স্থানে যারা শহীদ হয়েছেন এবং এপর্যন্ত যাদের নাম সংগ্রহ করা হয়েছে তারা হলেন -

১। গোলাম ইয়াজদানী
২। গোলাম হোসেন চৌধুরী
৩। আবদুল খালেক
৪। আহমদ আলী মোড়ল
৫। আলী করিম
৬। মোসলেম আলী তালুকদার
৭। আলী আজম
৮। আনছার আলী
৯। হায়দার আলী
১০। জুনাব আলী
১১। ফজল মিয়া
১২। মোঃ জয়নাল আবেদীন
১৩। সিরাজ
১৪। আলী নওয়াব
১৫। মরফত আলী
১৬। কাজী মাহবুব ইয়াজদানী
১৭। মোঃ ফসিউল আলম
১৮। কাজী নজরুল ইসলাম
১৯। নুরুল হক
২০। আবদুল মান্নান
২১। আবদুল হামিদ
২২। মমতাজ মিয়া
২৩। মোঃ আকবর হোসেন
২৪। ওজি উল্লাহ্
২৫। কফিল উদ্দিন
২৬। আব্দুল মজিদ
২৭। মোহাঃ শফিকুল ইসলাম
২৮। মোঃ নজির আহমদ
২৯। কবির আহম্মদ
৩০। মোঃ নুরুল হক (মোয়াজ্জেম)
৩১। সৈয়দুর রহমান
৩২। মোতাহার রহমান
৩৩। মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
৩৪। সৈয়দ আমীর আলী
৩৫। আলী হোসেন
৩৬। মোঃ আব্দুল) গোফরান
৩৭। সৈয়দুর রহমান
৩৮। আব্দুল আজিজ
৩৯। শামসুল হক
৪০। আবদুল করিম
৪১। আবদুল ওয়াব
৪২। আবদুল মতিন
৪৩। মহরম আলী
৪৪। মজিবল হক
৪৫। মোঃ ইছাক
৪৬। গোফরান মিয়া
৪৭। মোঃ আবদুল মন্নান
৪৯। সেওরাফ আলী
৫০। আবদুল গফুর
৫১। আবদুল সফিক মিয়া
৫২। আমিনুল ইসলাম
৫৩। আবুল কাশেম
৫৪। নোয়াব আলী
৫৫। বাদশা মিয়া
৫৬। বাদশা মিয়ার নাবালক পুত্র
৫৭। সুলতান আলম
৫৮। মোজাম্মেল হক
৫৯। নুরুজ্জামান (মধ্য মার্দাশা)
৬০। ঐ পুত্র (উভয়ে ট্রেন যাত্রী)

দোহাজারী নাজিরহাট ট্রেন যাত্রীসহ অনেক নাম না জানা বাঙ্গালীদের হত্যা করা হয়েছিল। অনেক নাম সংগ্রহ করা যায়নি। উক্ত দিন ছাড়াও পাহাড়তলী এলাকায় বিভিন্ন তারিখে পাকি-বাহিনী ও বিহারীরা যাদের হত্যা করেছিল তাদের নাম-

৬১। মোঃ ফকরুল ইসলাম
৬২। রমনী কুমার দাস
৬৩। এল, আর, খান
৬৪। জাহিদ
৬৫। এল আর খানের কন্যা (মেয়ের নাম সংগ্রহ করা যায়নি)
৬৬। এম, এ, চৌধুরী
৬৭। মোঃ শফি (রেলওয়ে অফিসার জনাব শফির সাথে আরো তের জনকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয়েছিল জল্লাদখানার একটু সামনে। উক্ত তেরজন বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে এনেছে বলে নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।)
৬৮। মোঃ ইউসুফ
৬৯। আবুল কালাম
৭০। আব্দুল আলীম (পিন্টু)
৭১। আবদুস সামাদ মিয়া
৭২। সৈয়দ মাহবুব আলী
৭৩। আব্দুস সালাম মিয়া
৭৪। হাসিনুর রহমান
৭৫। নুরুল আমিন
৭৬। মোঃ আব্দুল গফুর
৭৭। এ, বড়ুয়া
৭৮। আহমদ শাহ্ (হরু)
৭৯। ফখরুল আলম
৮০। মোঃ কদম আলী
৮১। মোঃ কাশেম
৮২। রওশন আলী খান
৮৩। আমানত আলী খান
৮৪। দেলোয়ার হোসেন খান
৮৫। গোফরান আলী
৮৬। মোঃ আব্দুল হাই (সিলেট)
৮৭। শেখ মোঃ আব্দুল আজিজ
৮৮। শেখ মোঃ আলী রেজা
৮৯। মাখন
৯০। সৈয়দা লায়লা বেগম
৯১। মোঃ মাজেদ আলী
৯২। আবু
৯৩। মোঃ হাফেজ উল্লাহ
৯৪। মোঃ সুজা উদ্দিন
৯৫। মোঃ ইসহাক
৯৬। ছাবেদ আলী
৯৭। হামিদুর রহমান
৯৮। বাহার
৯৯। মওছুদুর রহমান (সোহাগ)
১০০। মোঃ মিয়া চৌধুরী
১০১। বজল আহমদ
১০২। মোস্তাফিজুর রহমান (লেদু)
১০৩। আব্দুল মিঞা
১০৪। মোঃ এস, এম কামাল উদ্দিন
১০৫। ছালেহ আহম্মেদ
১০৬। ইদ্রিস মিয়া
১০৭। হাবিবুর রহমান
১০৮। বাদশা মিঞা
১০৯। আবুল হোসেন
১১০। মোঃ ইসহাক
১১১। মোঃ আলী
১১২। রওশন আলী খান
১১৩। এম, এ খান
১১৪। মোঃ ইউসুপ
১১৫। আলী আযম
১১৬। আব্দুল গফুর
১১৭। নিরঞ্জন বিকাশ বড়ুয়া
১১৮। বুলু
১১৯। শরীফ সাহেবের কন্যা আফরিনা
১২০। মোঃ আবদুল হাই (কুমিল্লা)

১০ই নভেম্বর ৭১ সন তারিখে উপরোক্ত তালিকা তাছাড়াও দি.ইঞ্জিনিয়ারিস লিঃ এর অনেক কর্মচারী, নাজিরহাট দোহাজারী ট্রেন ক্যাউতলা রেলওয়ে ষ্টেশনে থামিয়ে বহু বাঙ্গালীদের ধরে এনে জবাই করে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা শুধুমাত্র দুজন ট্রেনযাত্রীর নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও ঘটনাসূত্রে জানা যায় - মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শহীদলেন পাঞ্জাবী লেন ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল ও ট্রেনিং ক্যাম্প (মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সম্পূর্ণ রেলওয়ে এলাকার মধ্যে পাঞ্জাবীলেন ও মাস্টারলেনে শুধুমাত্র বাঙ্গালীরা বসবাস করতো)। এখান থেকে ডাঃ মাহফুজুর রহমান ও ডাঃ জাহাঙ্গীর কবীরের নেতৃত্বে সফলভাবে ১টি মালগাড়ী লাইনচ্যুত ও মশার কয়েলের মাধ্যমে ফয়েজ লেকে ইলেকট্রিক টাওয়ার উড়িয়ে দেয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিতভাবে অবাঙ্গালীরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মদদে এই হত্যাযজ্ঞ চালায়।

পাহাড়তলী গণহত্যায় শহীদ পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে ডা: নুর ল ইসলামকে লেখা খোলা চিঠি

বধ্যভূমির জমিতে স্থাপনা নির্মাণ কাজ বন্ধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ২০০২ সালের ১৬ নভেম্বর তৎকালীন সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম এরিয়া কমান্ডারের পক্ষে লে.কর্নেল মোঃ দেলোয়ার হোসেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কাছে অনুরোধ জানান (স্মারক নং-১৩০২/১১/কিউ)। জানা যায়, ২০০২ সালে উক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটি জনৈক রেহেনা বেগম গংয়ের কাছ থেকে পাহাড়তলী মৌজার বি এস ১৫২ ও ১৫৩ দাগের আন্দর এক দশমিক ৭৫৪ একর জায়গা এক কোটি ২০ লাখ টাকায় ক্রয় করে, যার দলিল নং ৩৮২০। সদর সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে ২০০২ সালের ১৯ মে এটি রেজিস্ট্রি হয়। কিন্তু তৎকলীন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের প্রকল্প কাটছাট করে মূল বধ্যভূমিকে পাশ কাটিয়ে পার্শ্ববর্তী ৮-১০ শতক জায়গায় দায়সারাগোছের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন উক্ত জমিটি তাদের এই দাবি করে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেয়। সিটি করপোরশের অভিযোগ, তাদের জমিতে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় বধ্যভূমির স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুমতি নেয়নি। সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস সূত্রে জানা গেছে ২০০১ সালে ভূমির মালিক সিটি করপোরেশনকে ১০ গ া ভূমি বধ্যভূমির জন্য দান করে।

জিয়াউর রহমানের নামে স্থাপিত জিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব বিজনেস আডমিনিসট্রেশন থেকে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার পর জিয়া শব্দটিকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে

এরপর শুর“ হয় বিভিন্নমুখী আইনি লড়াই ও দাপ্তরিক চিঠি চালাচালি। ১৮ নভেম্বর ২০০২ চট্টগ্রাম যুগ্ম জেলা জজ-২ আদালত কর্তৃক বধ্যভূমির জন্য চিহ্নিত জমির দাবিদার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অধিগ্রহণ বন্ধের জন্য দায়েরকৃত মামলায় অন্ড়র্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাওয়ায় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বরাবরে অভিযোগ করে এবং নির্মাণ কাজ বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জনান। যার স্মারক নং- পিউ/এনওসি/২০০২/১৬৫৪/৪৭ তারিখ ০৬-০৩-২০০৩। যুগ্ম জেলা জজ আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন মামলা দায়ের (মামলা নং- ১৮৯১/২০০৩) এবং হাইকোর্ট থেকে যুগ্ম জেলা জজের ১৩ এপ্রিল ২০০৩ তারিখের প্রত্যাহার আদেশ ছয় মাসের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের জন্য এল এ কেস নং- ১/২০০৩-২০০৪ নথিভুক্ত করা হয় এবং ভূমি অধিগ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন থেকে তিন ধারা নোটিশত প্রদান করা হয়। তৎপরবর্তী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের মধ্যে অনেক চিঠি চালাচালি হয়; কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গত ২৬ এপ্রিল ২০০৫ চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসককে ১.৭৫৪ একরের পরিবর্তে ২০ শতক জমি অধিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করে এবং ১৮ মে ২০০৬ এলএ কেস বাতিল করে জমি অধিগ্রহণে প্রদত্ত ৯৪ লাখ টাকা ফেরত প্রদানের জন্য পত্র প্রদান করে।

২০১০ সালে শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে গাজী সালেহ উদ্দিন হাইকোর্টে ভবন নির্মাণে স্থগিতাদেশ চেয়ে রিট পিটিশন দায়ের করে। রিট পিটিশনের প্রেক্ষিতে আদালত এই ভবন নির্মাণের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করে। এবং একই বছরের ৬ জুন সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের আদেশে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। মেজর জেনারেল (অব) শফিউল- াহর নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটিতে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, শাহরিয়ার কবির, ডা. মাহফুজুর রহমান, চট্টগ্রামের তৎকালীন জেলা প্রশাসক ফয়েজ আহমেদ অন্ড়র্ভূক্ত ছিল। কমিটি ২০১১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর স্থানীয় ২১ জন ভুক্তভোগী ও স্বজনহারানো লোকের সাক্ষাৎকার নেন। এর ভিত্তিতে তারা তাদের প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করেন।

২০১৪ সালের ৫ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ এই বধ্যভূমির উপর নির্মিত ইউএসটিসির ভবন অপসারণের নির্দেশ দেন। যদিও গত ছয় মাসে সে আদেশ পালন করা হয় নি। এই বধ্যভূমি সংরক্ষণ, আইনি প্রক্রিয়া মোকাবেলা, রিট দায়ের করা সরকারের বিভিন্ন মহলে চিঠি প্রদান এইসব কাজ অনেকটা একই করেছেন পাহাড়তলী গণহত্যায় শহীদ আলী করিমের পুত্র চট্টগাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গাজী সালেহ উদ্দিন।

মূল্যায়ন

পাহাড়তলী গণহত্যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি রক্তাক্ত অধ্যায়। এই বধ্যভূমিতে প্রায় দশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। ১০ নভেম্বর একদিনেই প্রায় ৪০০ লোককে হত্যা করা হয়েছে। এই গণহত্যার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটি পরিকল্পিত গণহত্যা এবং এই গণহত্যার মূল নায়ক ছিল স্থানীয় বিহারীরা। যারা মোহাজের হিসেবে সাতচলি- শের দেশভাগের পর ঝাউতলা, ওয়ারলেস কলোনী, শেরশাহ কলোনী এবং ফিরোজশাহ কলোনীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হত্যাকারীদের অধিকাংশই চাকুরি করতেন

পাকিস্ড়ান রেলওয়েতে এবং কেউ কেউ চাকুরি করতেন দি ইনজিনিয়ারিং লিমিটেডে অথবা এসব পরিবারের সদস্য, যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদেরও একটি বড় অংশ ছিল রেলওয়ের সাথে সম্পৃক্ত। হত্যাকারী এবং হত্যাকা ের শিকার দু'পক্ষই পরস্পরের পূর্ব পরিচিত ছিল।

এছাড়াও পাহাড়তলী বধ্যভূমি তথা জল- াদখানা বধ্যভূমিতে আরেক শ্রেনীর মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। যারা ছিল পাহাড়তলী বধ্যভূমির পাশ দিয়ে চলে যাওয়া চট্টগ্রাম- দোহাজারী, চট্টগ্রাম-হাটহাজারী-নাজিরহাট র টের ট্রেনের যাত্রী। ঝাউতলা এবং এর কাছের ষ্টেশন গুলোতে ওৎ পেতে থাকতো যমদূত। ট্রেন থামাতো, ওরা ইচ্ছেমত ধরপাকড় করত। একেকবার ৫০ থেকে ১৫০ জন পর্যন্ড় মানুষ বন্দী হতো ঝাউতলা স্টেশনে। এদেরকে লাইন ধরিয়ে কখনো বা মিলিটারির গাড়িতে আনা হত জল- াদখানায়।

এই গণহত্যার আরেকটি বৈশিষ্ট্য নির্যাতনের ধরণ ছিল ভিন্ন। অধিকাংশ লোককেই জবাই করে হত্যা করা হয়েছে, যেমন মুসলমানরা পশু কোরবানি দেয়। জবাই করার আগে কণ্ঠনালী কেটে দিত, ছুরি দিয়ে পেট ছিদ্র করে দিত। নারীদের পাহাড়ের ওপর বাংলোয় রেখে করা হত নির্যাতন। নির্যাতনের পর অনেককেই পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়। এই গণহত্যায় বেশ কয়েকজন পাকিস্ড়ানি সামরিক কর্মকর্তা জড়িত থাকলেও মূল দায়ভার বিহারীদের। মূলত স্থানীয় বিহারীরাই এই গণহত্যা ঘটিয়েছে। ট্রেনের যাত্রীদের নামিয়ে হত্যা করেছে, নারী নির্যাতন করেছে, সহকর্মীর স্ত্রী, কন্যাকে তুলে এনে নির্যাতন করেছে। যে জামায়াত নেতা মকবুলের কথা গণহত্যায় আসছে তিনিও ছিলেন অবাঙালি। তবে স্থানীয় শান্ড়ি কমিটির সভাপতি নবী চৌধুরী সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকলেও জানতেন সবকিছু, কিন্তু বাঙালিদের রক্ষায় কোন উদ্যোগ নেননি। যেসব রেলওয়ে কর্মকর্তা- কর্মচারী কিংবা রেলওয়ে পরিবারভূক্ত লোক এই গণহত্যায় শহীদ হয়েছেন তাঁরা সবাই পাহাড়তলীর স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন না। অধিকাংশই চাকরির কারণে দেশের নানা প্রান্ড় থেকে এখানে এসে বসবাস করতেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও ভূক্তভোগীদের ভাষ্য মতে ১০ নভেম্বর বিহারীরা যে চরম নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে এর কারণ ৪ জন স্থানীয় বিহারীর হত্যাকাণ্ড। যাদের পরিচয় জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় ৯ নভেম্বর রাতে নিহত ৪ বিহারী হত্যার প্রতিশোধ নিতেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে এই বিহারীদের কারা হত্যা করেছে এটা স্পষ্ট নয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। নাসির উদ্দিন চৌধুরী (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম জেলা ইউনিট কমান্ড, চট্টগ্রাম, ২০১৩

২। সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, অনুপম, ঢাকা, ২০১০

৩। গাজী সালেহ উদ্দিন, *প্রামাণ্য দলিল মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, বলাকা, চট্টগ্রাম, ২০১৩

৪। মাহফুজুর রহমান, ডা., *বাঙ্গালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ*, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযোদ্ধাদের গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩

৫। তপন কুমার দে, *গণহত্যা'৭১*, নওরোজ, ঢাকা, ২০০১

৬। শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম, *একাত্তরের বিজয় গাথাঁ*, ভূমিকা, চট্টগ্রাম, ২০১৪

৭। গাজী সালেহ উদ্দিন (সম্পা), *আত্মজ*, প্রজন্ম' ৭১ বিজয় দিবস স্মরণিকা, চট্টগ্রাম, ১৯৯৪

৮। *সংবর্তি*, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও শহীদ পরিবার সম্মিলন পরিষদ, ১৯৯৫

৯। সূর্যমুখী কাফেলা, *উন্মেষ*, চট্টগ্রাম, ১৯৭২

সাক্ষাৎকার

১. কাজী আমিনুল ইসলাম, পিতা-শহীদ কাজী গোলাম ইয়াজদানী , পেশা- ব্যবসা, ঠিকানা- ইয়াজদানী ভিলা, শহীদ স্মরণী আবাসিক এলাকা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: শহীদ লেন সমাজ কল্যাণ পরিষদ কার্যালয়, পাহাড়তলী চট্টগ্রাম, ১৩ নভেম্বর ২০১৪

২. মো: রাইসুল হোসেন সুজা (৬০),পিতা: শহীদ আকবর হোসেন, পেশা: চাকুরী, ঠিকানা: শহীদলেন, রেলওয়ে কলোনী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: শহীদ লেন সমাজ কল্যাণ পরিষদ কার্যালয়, পাহাড়তলী চট্টগ্রাম, ১৩ নভেম্বর ২০১৪

৩. উম্মে আতিয়া রহমান (পুতুল) (৬৫), পেশা- গৃহিণী, ঠিকানা- মোতাহের কন্ট্রাক্টর বাড়ি, শহীদ লেন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১৩ নভেম্বর ২০১৪। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১৩ নভেম্বর ২০১৪।

সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন: আহম্মেদ শরীফ, প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

৪. গাজী কামাল উদ্দিন (৫৫), পেশা- চাকুরি, পিতা- শহীদ আলী করিম, ঠিকানা-শহীদ লেন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: শহীদ লেন সমাজ কল্যাণ পরিষদ কার্যালয়, ১৩ নভেম্বর ২০১৪

৫. গাজী সালেহ উদ্দিন (৬৪), পেশা- অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রম বিশ্ববিদ্যালয়, পিতা- শহীদ আলী করিম, ঠিকানা-শহীদ লেন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: শহীদ লেন সমাজকল্যাণ পরিষদ কার্যালয়, ১৩ নভেম্বর ২০১৪

চট্টগ্রাম শহরের খুলশী থানাধীন পাহাড়তলী ***গণহত্যা*** নিয়ে গ্রন্থমালার বর্তমান গ্রন্থটি রচিত। একাত্তরের কারা, কীভাবে সেই ঘৃণ্যতম গণহত্যা সংঘটিত করেছিল নির্যাতিত, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য থেকে তা জানা যাবে; জানা যাবে শহীদদের নাম-পরিচয়, বীরাঙ্গনা ও নির্যাতিতদের পরিচয় এবং বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস ও বর্তমান অবস্থা। এ যেন মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্যের কয়েকটি রক্তভেজা পাতা, শহীদের আত্মদানের শিশিরসিক্ত গাঁথা– সর্বোপরি মুক্তিসংগ্রামের মর্মন্তুদ কাহিনী। গ্রন্থটি রচনা করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক

চৌধুরী শহীদ কাদের। এটি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ।